আগস্ট ২০২৪ ■ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জুলাইয়ের জয়গান

সৈয়দা তাকিয়া জান্নাত, নবম শ্রেণি, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

সিরাজুম মুনিরা বিভা, দ্বিতীয় শ্রেণি (ইংলিশ ভার্সন), সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদকীয়

২০২৪ সালের ছাত্র-গণআন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা। এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। এটি প্রথমে কোটা সংস্কার আন্দোলন থাকলেও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয়। তাদের এই আন্দোলনে যোগ দেয় দেশের আপামর ছাত্র-জনতা।

জুলাই মাসে ছাত্র-গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড'সহ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। ১৬ই জুলাই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। এই ঘটনাটি আন্দোলনকে আরো জোরালো এবং দেশজুড়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। অবশেষে ৫ই আগস্ট বিজয় আসে।

বন্ধুরা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও তারুণ্যের চেতনায় দেশে একটি নব শক্তির উত্থান ঘটেছে। সমগ্র জাতি আজ স্বপ্ন দেখছে বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত দেশ ও জাতি গড়ার। বর্তমান তরুণ সমাজ জাতিকে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগ আমরা ভুলতে পারব না। তাদের আত্মত্যাগে পাওয়া বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, সবার হাতে হাত রেখে দেশ গঠন করবে– এমনটাই আশা করি। ভালো থেকো বন্ধুরা, নবারুণের সাথে থেকো।

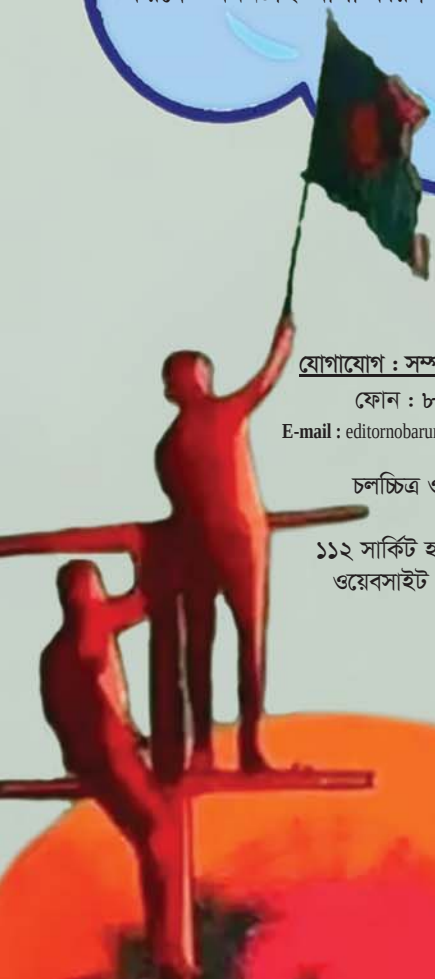

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

গল্প

০৬ আকাশেরা ছয় জন/ আশিক মুস্তাফা
১১ ঝরে যাওয়া ফুল/ খায়রুল আলম
১৪ বাবার ফিরে আসা/ আলমগীর কবির
১৮ বিপ্লবের গ্রাফিতি/ নুশরাত রুমু
২১ প্রজাপতি/ আহমেদ টিকু
৪২ অভিমানী রিয়া/ জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ

০৩ হাসান হাফিজ
০৪ জাকির আবু জাফর
০৫ তৌসিফ হাসনাত আনান
১০ আবু জাফর আবদুল্লাহ
১৬ শাহরিয়ার শাহাদাত
৪৬ এইচ এস সরোয়ারদী

স্মৃতিকথা

৩০ এঁকেছিলাম গ্রাফিতি/ মাওজুদা বিনতে সালাম

ছোটোদের ছড়া

১৬ মো. শাহ্ জাহিন দিগন্ত
১৭ লাবিবা তাবাসসুম রাইসা
৩৭ মায়িদা আক্তার/ মো. সজিব হোসেন
৪৬ তৌফিক আলম

ছোটোদের গল্প

২৩ জুলাই আন্দোলনে অন্তর/ মুহাম্মাদ বিহাম
৩২ এক পরিবারের কান্না/ আনাস আহমাদ
৩৫ আরিয়ানের স্বদেশ ভ্রমণ/ সিরাজুম মুনিরা
৩৮ সেদিন ছিল শুক্রবার/ তাহমিদুর রহমান জারিফ
৪০ কৃষ্ণচূড়ার ডালে লেগেছে আগুন/ মুমতাহিনা জাহান
৪৪ স্বপ্ন পূরণের আন্দোলন/ রিতু রাইয়ান

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সৈয়দা তাকিয়া জান্নাত/ সিরাজুম মুনিরা বিভা
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সেঁজুতি শীল
৪৬ রাফসান চৌধুরী
৫৯ হাফিজা আনান
৬০ শারিকা তাসনিম নিধি/ মালিহা ইসলাম
৬১ প্রিন্স বোস/ জুনায়েদ হোসেন জাবির
৬২ হামজা হোসেন/ নাফিসা তাসনিম স্নেহা
৬৩ রামিসা রহমান/ অহনা বিথি
৬৪ সুস্মিতা শীল

নিবন্ধ

২৬ গ্রাফিতি জুলাই-২০২৪/ মো. মনজুর হোসেন পাটোয়ারী
৪৭ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা/ শাহানা আফরোজ
৫১ শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিং/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৪ শিক্ষার্থীদের ত্রাণ সংগ্রহ/ মেজবাউল হক
৫৬ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শিক্ষার্থীরা/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৫৮ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়া যাবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

জুলাইয়ের জয়গান

হাসান হাফিজ

স্বপ্ন ছিল চোখে
উথালপাথাল স্বপ্নের ঢেউ
কার সাধ্য রোখে!
পরের হিতের উপকারের চিন্তা সারাক্ষণ
মায়ের বাবার পরম প্রিয় ভালোবাসার ধন।
মুগ্ধ নামের স্বপ্ন দেখা তরুণ,
স্বৈরাচারের দোসর পুলিশ করল তাকে খুন।
স্বপ্ন দেখাই কাল হয়েছে কাল
দেশ জনপদ বারুদ গন্ধে হলো যে উত্তাল।
চলছে সভা মিছিল স্লোগান
ক্ষোভ প্রতিবাদ ঝড়
রুদ্ররোষে উঠল ফুঁসে সে রূপ ভয়ংকর।
চলছে গুলি কাঁদানো গ্যাস এবং গ্রেফতার
ছাত্র তরুণ জনগণের ঐক্য অটুট বাহ! কী চমৎকার।
সোনার দেশে দুঃশাসনের
করাল থাবা জেঁকেই বসেছিল
চব্বিশেরই জুলাই-আগস্ট
তখতে তাউস তাসের সে ঘর উলটিয়ে সব দিল।
স্বৈরশাসন কেউ মানি না
হঠাও জগদ্দল
বুলেট বাধা যতই আসুক
চল এগিয়ে চল।
নির্যাতনের চাই অবসান
আর অনাচার নয়,
ঐক্য নিবিড় সামনে এগোও
নাইরে দ্বিধা ভয়।
চাই মুক্তি স্বাধীনতা
জনভাগ্যের পরিবর্তন চাই
ভাত ও ভোটের চাই অধিকার
এই প্রশ্নে আপোশ রফা নাই।
গুম হত্যা ক্রসফায়ারের
হোক অবসান হোক,
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাই
উঠল খ্যাপে দেশের সকল লোক।
দানা বেঁধে উঠল শেষে
দেশ খেপানো আন্দোলনের ডাক
দুঃশাসনকে হঠাও সবে একত্র হও একটি রবে
ধ্বংস নিপাত যাক
বীরের মতো শহিদ হলেন মুগ্ধ, সাঈদ
তরুণ তাজা প্রাণ,
জুলাই ঠিকই পথ দেখাবে আলোর দেখা স্বদেশ পাবে
জুলাই হচ্ছে উদাহরণ এবং পরিত্রাণ।

আমার বাংলাদেশে

জাকির আবু জাফর

ইচ্ছে হলে বিপ্লবী হও কিংবা জ্ঞানী-গুণী
আমার কথা থাকুক এবার তোমার কথা শুনি।
সত্যি কথা সত্যি করে বলতে যদি পারো
বলতে গেলে বলবে সবই ধারবে না ধার কারো।

এই পৃথিবীর সবাই মিলে মিথ্যে বলে যদি
সত্য স্রোতে ছুটতে থাকুক তবু তোমার নদী।
কেমন করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন কথা লেখো
বিপ্লবীদের জীবন থেকে কেমন করে শেখো!

বখতিয়ারের ঘোড়ার কথা কেমন তুমি জানো
কেমন করে খান জাহানের বীরত্বকে মানো।
শাহজালালের তরবারিকে বুঝতে পারো নাকি
এসব ভেবে যখন আমি উদাস হয়ে থাকি!

ঠিক তখনই তোমার দ্রোহ বলল কাছে এসে
বুকের ভেতর দেশ তুলেছি গভীর ভালোবেসে।
ভালোবাসার সেই প্রেরণায় উধাও চোখের নিদ
সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে মুগ্ধ ও সাঈদ।

আমার বুকও ভালোবাসায় পূর্ণ হলো শেষে
আমি এখন মুক্ত স্বাধীন আমার বাংলাদেশে।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ

তৌসিফ হাসনাত আনান

বৈষম্যের মাত্রা যখন ভেঙে দিল
ছাত্র-জনতার ধৈর্যের সব বাঁধ।
সিদ্ধান্ত নিলো গুঁড়িয়ে দেবে
স্বৈরাচারের দেশ রাজত্বের সাধ!

গর্জে উঠল শিক্ষার্থী-জনসাধারণ
না হয়ে সবাই স্তম্ভিত!
হতে দিল না তারা বাংলাদেশের
স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত!

স্বাধীনতা অর্জনের এসব দিনে
পথ যে ছিল বড্ড ভঙ্গুর!
আন্দোলন পেল তীব্র বেগ যখন
এক মেধাবীকে হারালো রংপুর!

বৈষম্যবিহীন স্বাধীন দেশের স্বপ্ন
জ্বালিয়েছিল সবার মাঝে স্ফুলিঙ্গ!
সেই স্বপ্নকে করতে বাস্তবায়ন
সহযোদ্ধারা হারিয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশে
আজ বৈষম্যের কোনো ঠাঁই নাই।
যদি পুনরায় ফিরে আসে বৈষম্য
তবে জাগ্রত হবে ৩৬শে জুলাই।

এসএসসি পরীক্ষার্থী,
কে. ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ

গল্প

আকাশেরা ছয় জন

আশিক মুস্তাফা

মোবাইল ফোনে ফ্রি ফায়ার গেম খেলছে আকাশ। আশপাশের কোনো কিছুতে মন নেই। অমনি ডাক দিলো মণি ময়রা-'ওই আকাইশ্যা, ময়দা মাখাস না ক্যারে, বেলা হইয়া যাইতাছে কইলাম।'

হম্বিতম্বি হয়ে আকাশ হাতের মোবাইল ফোনটা মিষ্টির কার্টুনের আড়ালে রেখে; বড়ো লাল বলটায় ময়দা ঢালে। টিন থেকে হাতের কর গুণে গুণে কাপে করে চিনি নেয়। তখনি একটা মিছিল যায় ছাত্র-জনতার, মণি ময়রা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দিয়ে। ময়দার বল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাস্তায় চোখ রাখে আকাশ। তার বয়সি অনেকেই আছে মিছিলে। একজন স্লোগান তোলে–আঠারোর হাতিয়ার;

অন্যরা বলে-গর্জে উঠুক আরেকবার!

আকাশের গায়ে কাঁটা দেয়! সে কিছুই বুঝতে পারে না। মিছিল যেতেই থাকে। বাতাসে কান পাতে। ফের স্লোগান ভেসে আসে–চাইতে গেলাম অধিকার,

সবাই বলে- হয়ে গেলাম রাজাকার!

লাল বলটার উপর হেলে থাকা আকাশ এবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

মিছিল তখনও যাচ্ছেই। ফের কানে এসে লাগে- বুকের ভিতর দারুণ ঝড়,

অন্যরা বলে-বুক পেতেছি গুলি কর!

আর স্বাভাবিক থাকতে পারে না আকাশ। বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। মণি ময়রাও কিছু বলে না। যেই আকাশ মণি ময়রার অনুমতি ছাড়া দোকান থেকে বাইরে পা ফেলে না; সেই আকাশ কিছু না বলে চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সুর সুর করে। আর তা

কেবল তাকিয়ে দেখছে মণি ময়রা।

দোকান থেকে বেরিয়ে মিছিলের সঙ্গে মিশে যায় আকাশ। স্লোগান ধরে সেও-

স্বাধীন বাংলার স্বাধীন গান,

রক্ত দেবো, দেবো প্রাণ...!

স্লোগানে স্লোগানে এগিয়ে যায় মিছিল। আগায় মিষ্টি দোকানের ছোট্টমোট্ট আকাশ। চার রাস্তার মোড়ে যেতেই কমে আসে মিছিলের গতি। সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্লোগান তোলে। আকাশ রাস্তার পাশের অকেজো একটা বৈদ্যুতিক খুঁটি বেয়ে চার-পাঁচ হাত উপরে উঠে। দেখে সামনে পুলিশ এবং বিজিবির গাড়ি। কাঁটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। আগাতে দিচ্ছে না মিছিল। মিছিলের সামনে থাকা ছাত্র-জনতা কাঁটাতারের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। পুলিশ তখন কাঁদানো গ্যাস ছোড়ে। সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। গ্যাসের শেল নিক্ষেপের পাশাপাশি লাঠিপেটাও করে। কিন্তু দমাতে পারে না ছাত্র-জনতাকে। সবাই একটু দূরে গিয়ে ফের স্লোগান তোলে-

বুকের ভিতর দারুণ ঝড়

বুক পেতেছি গুলি কর!

ওমা, অমনি গুলি শুরু করে পুলিশ। সঙ্গে বিজিবিও। গুলি খেয়ে আশপাশের অনেকেই লুটিয়ে পড়ছে। কেউ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে। ছোট্ট আকাশ কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এরই মধ্যে বুকে গুলি লাগা এক আপু আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে- পানি পানি করছে।

আকাশের গায়ে যেন রাজ্যের সাহস ভর করে। পুলিশ-গুলি কিছুতেই যেন তার আর ভয় নেই! সে এক বোতল পানি খুঁজে এনে আপুটার কাছে যায়। বোতলের ছিপি খুলে মুখে পানি তুলে দেয়। পানিতে মুখ ভিজিয়ে আপুটা পা টেনে পাশের একটা

দোকানের আড়ালে চলে যায়। সাহায্য করে আকাশ। সে দেখে, আরো অনেকেই কাতরাচ্ছে। আকাশ পানির বোতল হাতে আরেকজনের দিকে এগিয়ে যেতেই দ্রিম করে একটা গুলি এসে লাগে তার পায়ে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। ওই গুলি খাওয়া পা নিয়েই রাস্তায় পড়ে থাকা একজনের মুখে পানি তুলে দেয়। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তার পায়ের ব্যথা। বাড়তেই থাকে। শরীর থেকে তার পা-টা যেন কেটে ফেলছে কেউ! তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে একসময় ছোট্ট আকাশ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে হতে হারিয়ে যায়!

এরপর আর কিছুই মনে নেই তার।

কিছুদিন আগের কথা। মাঝরাতে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালের সামনের সড়ক ধরে একটু এগিয়ে যেতেই রাস্তায় দেখা মিলে আকাশের। সঙ্গে আরও পাঁচ জন। রাতের নিঝুম সড়কে গোল হয়ে বসে তারা মোবাইল ফোনে ফ্রি ফায়ার গেম খেলছে। সবার পাশেই রাখা ক্র্যাচ। ক্র্যাচ দেখে চোখ যায় ওদের পায়ের দিকে। একি! এই ছয়জনের সবারই একটি করে পা নেই। আরো আশ্চর্যের বিষয়, তাদের সবার নামই আকাশ। তারা জুলাই বিপ্লবে আহত হয়ে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালে এসেছে চিকিৎসা নিতে। হাসপাতালের একই ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন চিকিৎসা, ফিজিওথেরাপি নেওয়া, কৃত্রিম পায়ের প্রশিক্ষণ নিতে নিতে তারা একে অন্যের বন্ধু হয়ে ওঠে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। তবে ছয় জনের বন্ধুত্ব খুব ভালো হয়েছে। তাই তো একটু সুযোগ পেলেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় গিয়ে বসে। খোলা আকাশের নিচে। খেলে পছন্দের ফ্রি ফায়ার গেম।

পা হারানো এই ছয় আকাশের দুই আকাশ শিক্ষার্থী। আরেক আকাশ কাজ করত কাপড়ের দোকানে। সেলুনে কাজ শিখছিল এক আকাশ। অটো চালাতো আরেক আকাশ। আর মণি ময়রার দোকানের মিষ্টির কারিগর আকাশকে তো তোমরা চিনেই নিয়েছ! আচ্ছা, আকাশেরা এই ছয়জন কার মোবাইল ফোনে ফ্রি ফায়ার গেম খেলে? মণি ময়রার? ❑

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

ছড়াগান

আবু জাফর আবদুল্লাহ

এই এখানে বইছে নদী
ইলিশ বুকে ধরে
ধন্য আমি পলে পলে
দেশকে আপন করে ॥

গাছে গাছে পাখপাখালি
ভোর না হতে জাগে
মুগ্ধ তাই হৃদয় আমার
গভীর অনুরাগে
সুখে-দুঃখে এদেশ আমার
রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে ॥

শান্তি নামে গভীর রাতে
এই যে এখানে
চাঁদের বৃষ্টি ঝরে পড়ে
শরৎ অঙ্গনে
নদীর তীরে দাঁড়াই আমি
ভালোবাসায় ভরে ॥

গল্প

ঝরে যাওয়া ফুল

খায়রুল আলম

'বেশিক্ষণ ছাদে থাকিস না মা। তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসিস।'

'ঠিক আছে। ফুলগাছে পানি দিয়েই চলে আসব।'

বলেই রুম থেকে বের হয় মুনিয়া। ওর বয়স মাত্র এগারো। বাবা-মায়ের সঙ্গে সে থাকে তিনতলা একটি বাড়ির তৃতীয় তলায়। মুনিয়ার মায়ের শখ বাগান করা। তাই ছাদে ফল-সবজির গাছ লাগিয়েছেন। আছে নানারকম ফুলের গাছও।

ছাদে রাখা গাছগুলো মুনিয়ার বন্ধুর মতো। সে প্রতিদিন একবার হলেও ছাদে গিয়ে গাছগুলোর যত্ন নেয়। পানি দেয়। ফুলগুলোর দিকে খেয়াল রাখে। মাঝে মাঝে তার ছোট্ট ঘুড়িটা নিয়ে ছাদে যায়, ওড়ায়। মুক্ত আকাশে উড়তে থাকা ঘুড়ি দেখে আনন্দে মুখে হাসি ফোটে মুনিয়ার।

কয়েকদিন ধরে অন্যরকম সময় কাটছে সবার। সারা দেশের মতো ঢাকায়ও একটা তীব্র আন্দোলন চলছে। ছাত্র-জনতা তাদের দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। চারপাশে সবার মধ্যে চাপা আতঙ্ক। আকাশে শোনা যাচ্ছে হেলিকপ্টারের শব্দ। তাই মা সাবধান করে দেন মুনিয়াকে।

ছাদে উঠেই মুনিয়া তার প্রিয় ফুলগাছগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। ফুটে থাকা গোলাপ আর জবাফুলগুলোর

ওপর হাত বোলায়। ভালোবাসার মতো আদর করে। তখনই হঠাৎ কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তায় বিকট একটা শব্দ হয়। এর পরই গুলির শব্দে পুরো পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে। কোত্থেকে যেন সাঁই শব্দ করে একটা গুলি এসে লাগে ফুলগাছের গায়ে। গুলির আঘাতে ফুলের ডালটা কেঁপে ওঠে। মুনিয়া হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

'মুনিয়া! মুনিয়া!'

ডাকতে ডাকতে মা দৌড়ে ছাদে আসেন। মুনিয়ার কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। মা ছাদের এপাশে-ওপাশে তাকান। নাহ, কোথাও মুনিয়াকে দেখা যায় না।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবারও ডাকেন তিনি, 'মুনিয়া, কোথায় তুমি?'

এরপর দ্রুত পায়ে রেলিংয়ের দিকে যান। নিচে তাকান। গলির মুখের রাস্তায় অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে। মিছিল- স্লোগান দিচ্ছে। দূরে, মূল রাস্তায় বেশ কয়েকটি পুলিশের গাড়ি। অস্ত্র হাতে থাকা পুলিশের মুখোমুখি বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতা।

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসে মায়ের। কী করবে ভেবে পান না। মুনিয়ার বাবা অফিসে। কিন্তু মুনিয়া কোথায়? ছাদজুড়ে ভয়ানক নিস্তব্ধতা।

মা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল ফুলগাছগুলোর দিকে। একটি গাছের ডাল ভাঙা। দুটি ফুল মাটিতে পড়ে আছে। কী কারণে এমনটা হলো, বুঝতে পেরে বুকটা ধক করে ওঠে তার।

এমন সময় অস্ফুট কণ্ঠে 'মা' ডাক কানে আসে। চমকে উঠে শব্দের উৎস লক্ষ করে ছোটেন মুনিয়ার মা। ছাদের দরজার আড়ালে গিয়ে দেখতে পান জবুথবু হয়ে বসে আছে মুনিয়া। ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে।

'আমার সোনামানিক, তোর কিছু হয়নি তো?' বলে চিৎকার করে মুনিয়াকে বুকে চেপে ধরেন তিনি।

'না মা, আমার কিছু হয়নি। শুধু অনেক ভয় পেয়েছিলাম।' তারপর ঝরে পড়া ফুল দুটির দিকে আঙুল তুলে মুনিয়া বলল, 'ফুলগুলো কিন্তু আমি ছিঁড়িনি।'

মা অভয়ের হাসি হাসেন, 'আমি জানি রে। তুই তো আমার ফুল।'

মুনিয়া মায়ের হাত ধরে বলল, 'মা, তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো। আর তোমার মতো এই ফুলগুলোকে আমিও ভালোবাসি।'

'চল, ঘরে যাই।' মুনিয়াকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরেন মা। দুজন ছাদ থেকে নেমে বাসায় আসে। আসার সময় ঝরে যাওয়া ফুল দুটি কুড়িয়ে নেন মা।

বাসায় ঢুকেই মুনিয়া বলল, 'আচ্ছা মা, ফুলগুলো নিজে নিজেই গাছ থেকে ঝরে পড়ল কেন?'

মা মাথা নাড়ান, 'নিজে নিজে ঝরে পড়েনি।

কোনো কারণ তো আছেই।'

'কী কারণ, মা?' মুনিয়ার আগ্রহ যেন কমছেই না।

মুনিয়ার মাথায় মমতার হাত বোলান মা। বলেন, 'শোন, আমাদের চারপাশে প্রতিদিনই অনেক ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে ভালো মানুষ যেমন আছে, তেমনি খারাপ মানুষও আছে। কেউ গাছ আর ফুলের যত্ন নেয়, কেউ সেগুলো ধ্বংস করে।'

এরপর কুড়িয়ে আনা ফুল দুটি মুনিয়ার হাতে দিয়ে বলেন, 'আরেকটু বড়ো হলে সব বুঝতে পারবি।

মানুষকে যেমন ভালোবাসতে হবে, তেমনি এই প্রকৃতি, গাছপালা, ফুলকেও ভালোবাসতে হবে। ঠিক আছে?'

'হুঁ।' বলতে বলতে মুনিয়া উপর-নিচ মাথা নাড়ায়। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হাতে থাকা ফুল দুটির দিকে। ❑

শিশু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

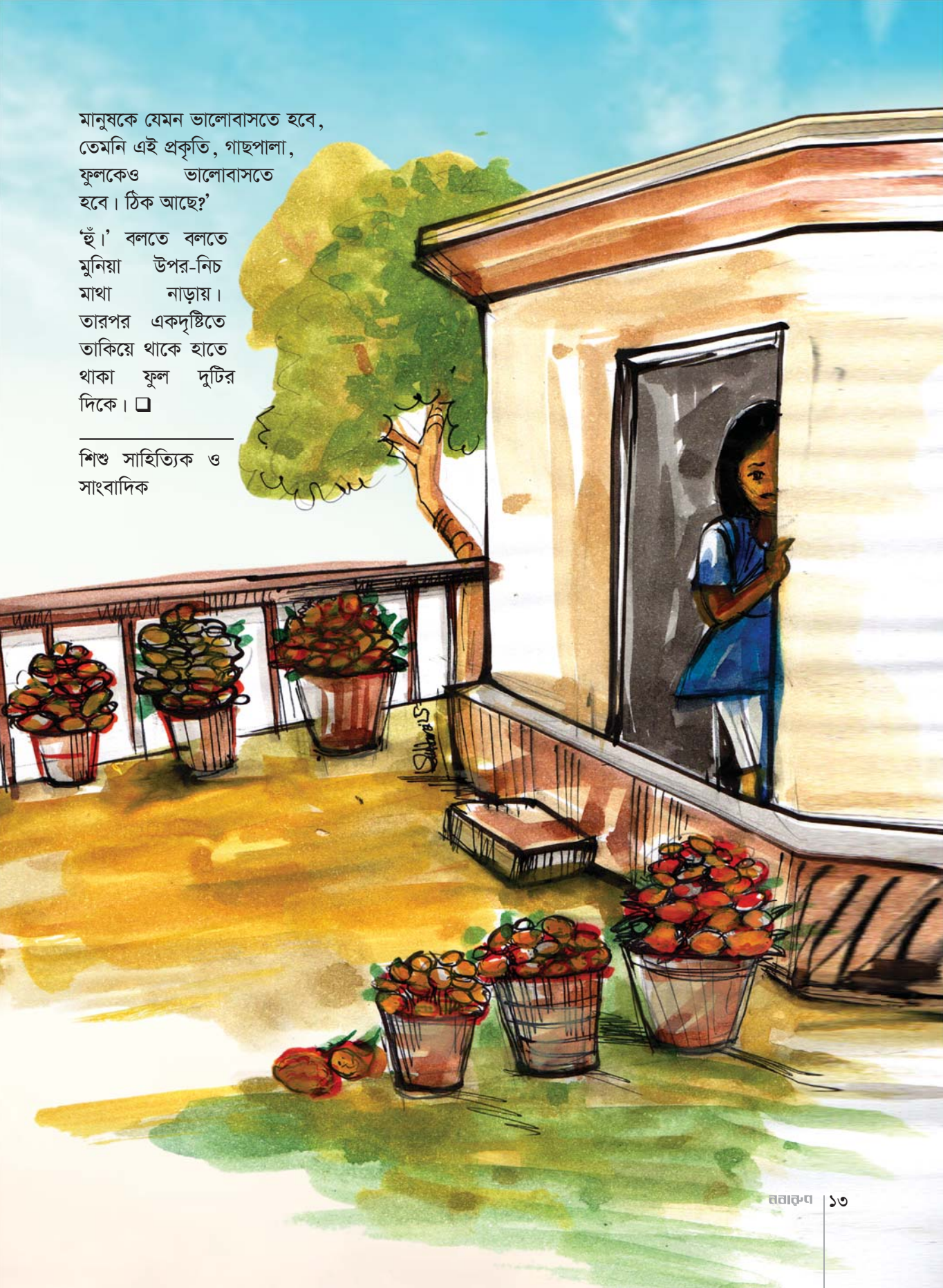

গল্প

বাবার ফিরে আসা

আলমগীর কবির

ছোট্ট মেয়ে মিতু। পড়ে ক্লাস ফোরে। নাটোর রেলওয়ে স্টেশনের পাশে থাকে সে বাবা মায়ের সাথে। তার বাবা রিকশা চালায়। আজ সকাল সকাল বাবার কাছে একটা বায়না ধরেছে সে। এক সেট রং পেন্সিল কিনে দিতে হবে তাকে।

দেশের অবস্থা ভালো নয়। ইশকুলে ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

মিতু অবসরে খাতার পাতায় নদী আঁকে, পাখি আঁকে, ফুল আঁকে। পতাকা আঁকে। সবাই রং পেন্সিল দিয়ে তাদের আঁকা ছবিগুলো রং করে। শুধু মিতুর রং-পেন্সিল নেই। তাই সে আজ তার বাবার কাছে রং পেন্সিল কিনে দেবার বায়না ধরেছে।

মিতুর বাবা হেসে বলেন, আচ্ছা মা বিকেলে তোমার জন্য রং পেন্সিল কিনে নিয়ে আসব।

মিতুর বাবা রিকশা নিয়ে বের হয়ে যান। মিতু বলে, সাবধানে যেও বাবা।

মিতুর বাবা বলেন, তুমি ঘরে থাকো মা। আমি যাচ্ছি।

মিতুর মন আনন্দে ভরে ওঠে।

মায়ের কাছে গিয়ে বলে, মা-বাবা আজ আমাকে রং পেন্সিল কিনে দেবে বলেছেন।

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মিতু চমকে ওঠে। মায়ের মন ভালো নেই। চোখে মুখে ভয়ের ছায়া। কী হয়েছে মা?

মা বলেন, শহরে ছাত্রদের মিছিল হচ্ছে। পুলিশ নাকি

বাধা দিচ্ছে! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।

মিতু মায়ের কথা শুনে একদম চুপ হয়ে যায়। বাবার জন্য তার ভয় হয়। মিতু জানে তার বাবা ছাত্রদের বিপ্লবের পক্ষে আছে। মাকে সে কিছু বলেনি। বাবা গতকাল আহত এক ছাত্রকে রিকশা করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার কাছে সেই গল্প করেছিলেন বাবা।

এখন তাহলে কী হবে?

মিতুর সময় আর কাটে না। তার বাবা কখন ফিরবে?

সারা বিকেল কেটে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে। মিতু ও তার মা পথ চেয়ে থাকে। তার বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায়। মিতু বাবুল কাকার চায়ের দোকানে গিয়ে অনেক কিছু শুনে এসেছে।

আজ ছাত্র-জনতার বিজয় হয়েছে। দূর থেকে মিছিলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে মিতুর ইশকুলের স্যার তাদের বাড়িতে এসে হাজির।

স্যার বলেন, মিতু তোমাদের এখন হাসপাতালে যেতে হবে। তোমার বাবা হাসপাতালে আছেন? মিতু আর তার মা কান্না করতে থাকে। মিতু বলে, কী হয়েছে বাবার?

স্যার বলেন, আজ সকাল থেকে ছাত্র-জনতার মিছিল ছিল। পুলিশ বাধা দিয়েছে তাতে। গোলাগুলি হয়েছে। অনেকে মারা গেছেন। অনেকে আহত। তোমার বাবা রিকশা করে অনেককে হাসপাতালে আনা নেওয়া করছিল। হঠাৎ একটা গুলি লেগেছে। ভয়ের কিছু নেই। গুলি তোমার বাবার পায়ে লেগেছে। তোমরা চলো আমার সাথে।

মিতুরা দ্রুত হাসপাতালে চলে যায়। মিতু তার বাবাকে দেখে। ডাক্তার এসে বলেন, ভয়ের কিছু নেই। মিতু তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে।

তিন দিন পরে মিতুর বাবা বাসায় ফিরেন হুইলচেয়ারে। ডাক্তার বলেছেন, ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বাড়িতে অনেক মানুষের ভিড়।

সবাই মিতুর বাবার সাহসের তারিফ করছেন।

রং পেন্সিল না পেয়েও মিতু আজ অনেক খুশি। সবাই মিতুর বাবার গল্প করছেন! কীভাবে রিকশা করে অনেককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি! মিতু অবাক হয়ে তাদের কাছ তার বাবার গল্প শুনতে থাকে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

কবিতাগুচ্ছ

বিপ্লবী মহরত

শাহরিয়ার শাহাদাত

ভাতের গন্ধে গুলির ধোঁয়া
লাশের ওপর লাশ
অধিকারহীন রাষ্ট্রে এ কী
নির্মম পরিহাস!

স্বাধীন দেশে এখন শুধু
দৈত্য দানোর বাস
বাতিল হটাও তৈরি করো
নতুন ইতিহাস।

ভয় করে জয় দীপ্ত তরুণ
ঊর্ধ্বে তুলে শির
সামনে চলো, সাহস বুকে
জাগাও তিতুমীর।

মৃত্যুপুরী স্বদেশ দেখার
সময় হলো শেষ
স্বৈরাচারের পতন করে
সাজাও এবার দেশ।

আসবে বিজয় হাল ছেড়ো না
ছাড়বে না রাজপথ
তোমার বারুদ স্লোগান হবে
বিপ্লবী মহরত।

গণ-অভ্যুত্থান

মো. শাহ্ জাহিন দিগন্ত

সত্যের অধিকার নিয়ে নেমেছিল ছাত্র-জনতা,
তাদের দাবি মানতেই হবে একটিই ছিল কথা ।

কোটার জন্য সুবিধা হারাবে মেধাবীরা?
এটি মানতে নারাজ ছিল তারা।
তাই তো গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছিল,
আবু সাঈদ, মুগ্ধরা ।

আজীবন সত্যের হয়েছে জয়,
সত্য অধিকার নিতে নেই কোনো ভয়।

কোটা আন্দোলনের শহিদদের,
স্মরণ করব শ্রদ্ধাভরে।
তাদের অনুসরণ করব,
তাদেরই পথ ধরে।

দশম শ্রেণি, নওগাঁ কে. ডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ।

৩৬শে জুলাই

লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

ছাত্র-জনতা আঘাত হেনেছে
অন্যায়ের প্রতি দোরে,
অসমতার দেয়াল যখন
সমাজে উঠে গড়ে।

এই দেয়ালের বিষাক্ত ছায়ায়
ছাত্ররাই আলো জ্বালে
বৈষম্যের কালো ছায়া তখন
দূর হয় প্রতিকালে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র মশাল
প্রজ্বলিত আজন্মই
সেই আলোতে পথ দেখছে
প্রত্যেকটা প্রজন্মই।

ভুলে যেও না জুলাইয়ের
লাখো যোদ্ধার স্মৃতি
তাঁদেরই মাঝেই খুঁজে পাবে
ইতিহাসের বিস্তৃতি।

বৈষম্যে সিক্ত যে শহর
চাপা পড়েছিল লাশে,
সে শহরকে বাঁচাতেই
আবু সাঈদেরা আসে।

এসব দেখে এতদিন যারা
মুখ রেখেছিল বন্ধ,
পিঠে হাত দিলে দেখা যাবে তাদের
নাই কোনো মেরুদণ্ড।

জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
হয়েছিল রণক্ষেত্র
বন্দুকের নলে ছাত্রের রক্ত!
ভিজবে সবার নেত্র।

স্বাধীনতার এই গল্প
জানুক আজ সবাই
ইতিহাসের নতুন এক মোড়
৩৬শে জুলাই।

দশম শ্রেণি, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

বিপ্লবের গ্রাফিতি

নুশরাত রুমু

সকাল থেকে রওনকের কিছুই ভালো লাগছে না। কয়েকদিন ধরে দেশের পরিস্থিতি খারাপ। স্কুল বন্ধ ঘোষণা হয়েছে। সে এবার হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। নতুন নতুন কত বন্ধু! স্কুলে না গেলে বন্ধুদের সাথে দেখা হয় না তাই তার খুব খারাপ লাগে। করোনা মহামারির সময় এরকম প্রায় দু'বছর তারা স্কুলে যেতে পারেনি। শেষে কত কষ্টে পরীক্ষা হলো।

এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠে নতুন ঝামেলা। পড়ার বই আছে কিন্তু আগের মতো প্রশ্ন নেই, স্যাররা পড়া মুখস্থ করতে

দেয় না। বিশাল বিশাল আর্ট পেপারে বড়ো করে লিখে ফুল পাতার ছবি এঁকে সাজাতে হয়। রওনকের এসব কাজ ভালো লাগে না। বছরের ৬ মাস হলো এখনও কোনো পরীক্ষাও হয়নি। সরকার নতুন কারিকুলামে পড়ানো শুরু করেছে। রওনকের মা পড়াতে বসে অবাক হয়। আগের মতো বাচ্চাদের কোনো পড়া দেওয়া হয় না। উলটো মোবাইল দিয়ে বিভিন্ন সিস্টেমে গ্রুপ ওয়ার্ক দেয় টিচাররা। সেজন্য ইচ্ছে না থাকলেও তার মা ওয়াইফাই কানেকশন নিলো। এমনিতেই বাচ্চারা মোবাইল ফোন পেলে পৃথিবী ভুলে যায়। কী যে হচ্ছে এসব ভেবে তিনি খুব বিরক্ত।

নাশতা করে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে রওনক ড্রয়িং রুমে টিভি দেখতে গেল। টিভির সামনে দাদু বসে আছে। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে খবর দেখছেন। রওনক দাদুর পাশে বসল। কিছুদিন ধরে কলেজের ছাত্রদের সাথে সরকারের ঝামেলা হচ্ছে। প্রতিদিন কলেজের সামনে, বড়ো রাজপথে ছাত্ররা আন্দোলন করে। পুলিশ তাদের বাধা দেয়, ধাওয়া করে, কোথাও কোথাও ভাংচুর হয়। রংপুরে কোনো ছাত্র মারা গেছে। সেটা নিয়ে ছাত্ররা আরও রেগেছে। রওনকের এসব দেখতে ভালো লাগছে না। সে কুকুর নিয়ে নতুন একটা ছবি বের হয়েছে সেটা দেখবে ভেবেছিল কিন্তু দাদু যেভাবে রিমোট আঁকড়ে বসে আছে তাতে কিছুতেই এখন দেবে বলে মনে হচ্ছে না। সে মাকে লুকিয়ে ব্যাটটা নিয়ে চুপিচুপি ক্রিকেট খেলতে বের হয়ে যাচ্ছিল। সদর দরজা খুলতেই ওর বড়ো ভাই রাব্বি এসে বাসায় ঢুকে পড়ল। রাব্বি ঢাকা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। রাব্বি তার মুখ চেপে ধরে তাকে বেডরুমে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, তোকে যে পরশু বড়ো মামা ১০০০ টাকা দিয়েছিল সেটা আছে? রওনক ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। আমাকে টাকাটা দে ভাই, খুব দরকার। আমি তোকে আগামী সপ্তাহে দিয়ে দেবো। রওনক প্রথমে দিতে চাইল না। রাব্বি তাড়া দিলো, জলদি কর, আমাকে গ্রাফিতি আঁকতে যেতে হবে। তার জন্য রং, স্প্রে এসব কিনতে আমার কাছে যা টাকা ছিল সব শেষ। আরও লাগবে। রওনক না বুঝে বলল, গ্রাফিতি কী ভাইয়া ? দেওয়ালে ছবি আঁকা। তোকে রাতে ফিরে বাকি সব বুঝিয়ে বলব। এখন

টাকাটা দে ভাই। মা দেখলে আর বেরোতে দেবে না। টাকাটা নিয়ে রাব্বি ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল। মা দাদুকে চা দিতে যেতে দেখল রওনক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তক্ষুণি তাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রওনক একটু আগের ঘটে যাওয়া এই ঘটনা চেপে গেল। দুপুরে খাবার পর দাদুর চিৎকারে সবাই মিলে ড্রয়িং রুমে গেল। টিভিতে লাইভ খবর দেখাচ্ছে। পুলিশ ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হচ্ছে । রাব্বি আসেনি দেখে তার মা অস্থির হয়ে সব দিকে ফোন করতে লাগলেন। রওনক ভাইয়ের জন্য চিন্তায় পড়ল। ভাইয়া তো সরকারের কথা কী যেন বলেছিল, কেন যে তখন সে মাকে ডাকেনি তার খুব আফসোস হলো কিন্তু ভয়ে মাকে কিছু বলল না।

অবশেষে সবার চিন্তা সত্যি হলো। গত কয়েকদিন হলো রাব্বি বাসায় ফেরেনি। ওর বন্ধুদের কয়েকজনও নিখোঁজ। কারো কোনো খবর পাওয়া যায়নি। রাব্বির মা কেঁদে কেঁদে অস্থির। আত্মীয়দের অনেকে এসে তার মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ওর বাবা বিদেশ থেকে

অনবরত ফোনে খোঁজ নিচ্ছেন। সবার নজর এখন টিভির খবরে। ছাত্রদের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন আহত নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। ছাত্রদের পাশাপাশি পথচারী, নারী, শিশু সবাই হামলার শিকার। ছাত্ররা তুমুল গতিতে প্রতিবাদ করছে। সারা দেশের দেওয়ালে দেওয়ালে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রাফিতি আঁকা হচ্ছে। এ এক নতুন প্রতিবাদের ভাষা। যেন দেশে আরেকটি একাত্তর (যুদ্ধ) ফিরে এসেছে।

প্রথম দিকে রওনক এসব খবর শুনতে আগ্রহী না হলেও ভাইকে না পেয়ে সেও নিয়মিত টিভির খবর দখছে। পরদিন গভীর রাতে তারা রাব্বির লাশের খবর পেল। তারপর থেকে রওনকদের পরিবারের হাসি হারিয়ে গেল। অনেক রক্তের পর একদিন দেশ শান্ত হলো। প্রবল আন্দোলনের মুখে শোষণকারী,খুনি সরকারেরও পতন হয়। মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রওনক স্কুলে যাওয়া শুরু করে। পথে যেতে যেতে দুই পাশের দেওয়ালে আঁকা বিপ্লবের গ্রাফিতি দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেদিন দুপুরে রাব্বি ভাইয়াও বলেছিল সে গ্রাফিতি আঁকতে যাচ্ছে। রওনক তখন না বুঝলেও এখন সে জানে এগুলো ভাইয়ের রক্তের দামে আঁকা সেই গ্রাফিতি। গভীর দুঃখ বুকে চেপে কপালে হাত উঁচিয়ে সে সালাম জানায়। ❑

গল্পকার

গল্প

প্রজাপতি

আহমেদ টিকু

অন্তির পরীক্ষা শেষ। মামা বাড়ি বেড়াতে এসেছে ও। মামা বাড়িতে এবার কোনো আনন্দ নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, হাসি নেই। কেন নেই ? সবাই জানে। কিন্তু কেউ কিচ্ছু বলে না। নানু হাসে না, নানি হাসে না, মামা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ান, মাও হাসে না। মামি তো অর্ধপাগলিনী! তার বোধ হয় দিন-রাত সমান হয়ে গেছে। এ বাড়িতে একটা প্রজাপতি ছিল। বাড়িময় উড়ে বেড়াতো প্রজাপতিটা। সবার হাসি-আনন্দ জড়িয়ে ছিল প্রজাপতিটাকে ঘিরেই। সেই প্রজাপতিটা হঠাৎ হারিয়ে গেছে না ফেরার দেশে। এ বাড়ির সব সুখ নিয়ে গেছে সেই চঞ্চলা প্রজাপতিটা।

এ বছর আগস্ট মাসের প্রথম দিকের কথা । সারা দেশে তখন টালমাটাল অবস্থা। ছাত্র-জনতা সবাই তখন পথে। মা বলছিল রূপকথার কোনো ডাইনি নাকি দেশের রানি হয়েছে। সে সবার উপর অত্যাচার করে। সবাই চায় সে ছেড়ে দিক দেশের সিংহাসন। সে তো কিছুই শোনে না। সে আরও অনড় হয়।

মানুষ মারার জন্য তার বাহিনীকে আদেশ দেয়। তারা যত্রতত্র গুলি ছোড়ে, সেই গুলি লাগে – পথচারীর বুকে, জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে অবুঝ শিশুর বুকে, ছাদে ওঠা কিশোরীর বুকে।

সেদিন সবাই বাড়িতে ছিল। না থেকে উপায় ছিল না। বাইরে উন্মত্ত জনতার ঢল। গাড়ি চলাচল একদম বন্ধ। অফিস-আদালত অঘোষিতভাবে ছুটি ছিল। বাইরে একটা মিছিল চলে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল গোলাগুলির শব্দ। অন্তির মামারা থাকত তাদের চারতলা বাড়ির তিনতলায়। কৌতূহলী মামাতো বোন বিন্তি জানালায় গিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলেছে মাত্র। ফুট করে একটা আওয়াজ হয়। বিন্তি মেঝেতে পড়ে যায়। সবাই ছুটে আসে। ওর মাঝ কপালে একটা গর্ত। মুহূর্তেই লাল হয়ে যায় ওর জামাকাপড়, লাল হয় সাদা টাইলসের মেঝে। বিন্তি মায়ের কোলে শুধু একবার চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকালো মাত্র। তারপর সব শেষ...। ও আর একবারও নড়েনি, একটি কথাও বলেনি। অন্তিরা বিন্তিকে শেষ বিদায় দিতেও আসতে পারেনি। তখন রংপুর থেকে ঢাকায় আসার মতো অবস্থা ছিল না। ভেবে ওর দু'চোখ দিয়ে ক'ফোটা অশ্রু আপনিই ঝরে পড়ল।

বিন্তি চলে গেছে। অন্তির মনে হচ্ছে– বিন্তি নয়, চলে গেছে এ বাড়ির সবার সুখ, শান্তি, হাসি,স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্ক্ষা। ঘরে বিন্তির সাজানো পড়ার টেবিল। সাজানো তৃতীয় শ্রেণির বই, খাতা, কলম সব অমনিই পড়ে আছে। একদিকে সাজানো আছে ওর পুতুল, খেলনা আরও কত কী! দেখতে দেখতে অন্তির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

অন্তি দেখে জানালা দিয়ে আলো এসেছে ঘরে। আলো পড়েছে বিন্তির পড়ার টেবিলে, খেলনাপাতিতে। আলো পড়েছে বিন্তির জামাকাপড়ে। দেখে একটা প্রজাপতি – অদ্ভুত সুন্দর একটা প্রজাপতি! উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বসছে টেবিলে, খেলনায়, জামাকাপড়ে। অন্তি কাছে গিয়ে হাত বাড়াতেই প্রজাপতিটা ওর হাতে এসে বসে। ডানাদুটোকে বারবার নাড়ায়। মনের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে – বিন্তি! ❑

শিশুসাহিত্যিক

ছোটোদের গল্প

জুলাই আন্দোলনে অন্তর

মুহাম্মাদ বিহাম

ডেমরা থানার ডগাইর এলাকা। এ এলাকার টিনসেড এক বাড়িতে ভাড়া থাকেন হামিদা বানু। ছেলে অন্তর তার একমাত্র অবলম্বন। অন্তর যখন তিন বছরের ছেলে তখন তার বাবা রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়। সেই থেকে ছেলে অন্তরকে নিয়ে হামিদা বানুর বেঁচে থাকার লড়াই।

ছেলেকে তিনি যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখেন। প্রতিবেশী এক খালার সহযোগিতা হামিদা বানুর ভরসা। খালাকে পেয়ে তাই তিনি অনেকটাই নিরাপদে চলতে পারেন। বাসা থেকে অনেক দূরে এক পোশাক কারখানায় কাজ নিলেন। মজুরি যা পান তা দিয়ে সংসার চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বাসা ভাড়া ও ছেলের প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে প্রায়ই তাকে হিমশিম খেতে হয়। তবুও তার মনে কঠিন সংকল্প। ছেলেকে তিনি মানুষের মতো মানুষ করবেন। দেশের প্রয়োজনে যাতে কাজে আসে সেভাবেই গড়ে তুলবেন।

সারাদিন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কাজ শেষে তিনি গাড়িতে বাসায় ফিরতে পারেন না। গাড়ি ভাড়ার টাকা জমিয়ে রাখেন। ছেলে বড়ো হচ্ছে। তাকে ভালো কোনো ইশকুলে দিতে হবে। একদিন সত্যি সত্যিই অন্তরকে ভালো ইশকুলে ভর্তি করানো হলো। ছেলে ইশকুলে যায়। মা হামিদা বানু পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে মনে স্বপ্ন আঁকেন- ছেলে একদিন বড়ো হয়ে পুলিশ হবে। দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। তখন আর হামিদা বানুর দুঃখ থাকবে না। সবাই অন্তরের মাকে সম্মান করবে। ভালোবাসবে।

অন্তর পড়ালেখায় মোটামুটি ভালো। সব ক্লাসেই ভালো ফলাফল করে। মা হামিদা বানুর খুশি আর ধরে না। দেখতে দেখতে অন্তর এখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। এক বছর পরেই সে কলেজে উঠবে। ভাবতেই হামিদা বানুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শত কষ্ট ভুলে গিয়ে আবারও নতুন শক্তি ফিরে পান।

অভাবে-অনটনে ভীষণ কষ্টে কাটছিল জীবন। অস্থির দেশটা আরও অস্থির হয়ে উঠছিল। স্বৈরশাসকের কবলে পড়ে দেশটা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। দেশের মানুষ আর কত সহ্য করবে! সব ক্ষেত্রে অনিয়ম আর দুর্নীতি। লুটেপুটে খাওয়ার এক মহা উৎসব দেশজুড়ে। তখনই জেগে উঠল ছাত্রসমাজ। ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলো সাধারণ জনগণ। পাড়া-মহল্লার ছাত্ররা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলল। জুলাই মাসে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপ নিলো। দেশের প্রতিটি জেলায় শুরু হলো গণ-আন্দোলন। স্বৈরশাসকের পতনই একমাত্র লক্ষ্য। অলিতে-গলিতে আন্দোলনের ঝড় বইতে শুরু হলো।

অন্তর ভাবল, এখন বসে থাকার সময় নয়। দেশের প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়াই হবে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাজ। মাকে বলতেই ধমক খেতে হলো। মা বুকে জড়িয়ে রাখলেন। বললেন, না বাবা। তুই যে আমার একমাত্র অবলম্বন। তোর কিছু হলে আমি কী নিয়ে বাঁচব!

মাকে কিছু বলতে পারেনি অন্তর। শুধু মনে মনে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার সময় গুণতে লাগল।

জুলাইয়ের ষোলো তারিখে রংপুরে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদ শহিদ হন। এতে সারা দেশের মানুষ আন্দোলনে ফুঁসে ওঠে। এক দাবির জোড়ালো আন্দোলনে সারা দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'লংমার্চ টু ঢাকা' ঘোষণা করে।

অন্তর মাকে না জানিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। মায়ের প্রতিবেশী খালাকে জানিয়ে গেল। তবে মাকে না জানাতে সতর্ক করে দিলো। একদিন মা ঠিকই জেনে গেলেন। রাগও করলেন খুব। কিন্তু অন্তর মাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলল। মা, তুমিই তো বলতে, আমি যেন বড়ো হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে পারি। এখন তো সে সময় এসেছে মা। দেশের মানুষকে স্বৈরশাসকের জুলুম থেকে বাঁচাতে এগিয়ে না গেলে কী হয়, বলো! আমার মতো লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে পথে

নেমে এসেছে। এখন ঘরে থাকার সময় না। দেশের কঠিন সময়ে দেশের পাশে থাকাই তো ভালো মানুষের দায়িত্ব। মা সেদিন আর আপত্তি করেননি। ছেলেকে আন্দোলনে যেতে বুকটা খালি করে দিয়েছেন।

আগস্টের পাঁচ তারিখ। ডেমরা থেকে অন্তর ছুটে আসে যাত্রাবাড়ি। গণ-আন্দোলনে অংশ নিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। মহাসড়কের চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে অস্ত্র ও গুলির মুখে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ছাত্র-জনতা। পুলিশের ছোড়া গুলিতে নিস্তেজ পড়ে যাচ্ছে কত তাজা প্রাণ। এক সময় এমনই এক ঘাতক বুলেট ছুটে আসে অন্তরের দিকে। অন্তর কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুলেটটি অন্তরের তাজা বুকটা ঝাঁঝড়া করে দিলো। মুহূর্তেই মৃত্যুকে বরণ করে ঢলে পড়ল পিচঢালা রাস্তার প্রশস্ত জমিনে। অন্তরের মতো আরও শত শত তাজা প্রাণে পিচঢালা কালো রাস্তাটা সেদিন রক্তিমবর্ণ ধারণ করল! মৃত্যুর গন্ধে ভারী হলো যাত্রাবাড়ির আকাশ-বাতাস-আঙিনা।

মা হামিদা বানু সাতদিন ছেলে অন্তরকে কোথাও খুঁজে পাননি। থানায় থানায় ঘুরেছেন। আশপাশের হাসপাতালে খুঁজেছেন। সাতদিন পর শনির আখড়ার এক ছেলের সহযোগিতায় ঢাকা মেডিক্যালে তাকে পাওয়া যায়। মা হামিদা বানু কাছে গিয়ে ছেলেকে দেখলেন। বুকের ধন নিথর হয়ে শুয়ে আছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ❑

অষ্টম শ্রেণি, কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কমবেশি আমরা সবাই 'গ্রাফিতি' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, বাইরের যে-কোনো ধরনের আঁকাআঁকিকেই কি আমরা গ্রাফিতি বলব? বা যে-কোনো রকমের দেয়াল লিখনকেই কি আমরা গ্রাফিতি বলব? যদি না বলি, তাহলে জানতে হবে গ্রাফিতি শব্দের আদ্যোপান্ত।

গ্রাফিতি শব্দটি ইতালিয়ান 'গ্রাফিতো' শব্দ থেকে জাত। এর অর্থ হলো 'খচিত'। শব্দের অর্থগত দিক থেকে বিশেষণ মনে হলেও বাংলা অর্থ বিবেচনায় এটি বিশেষ্য পদ। সাধারণভাবে গ্রাফিতি হলো দেয়াল বা রাস্তায় আঁকা কোনো চিত্র বা লেখা। শব্দটির মাধ্যমে চিত্র অঙ্কন, শিলালিপি বা এ ধরনের কোনো শিল্পকে বোঝালেও গ্রাফিতি মূলত প্রতিবাদের এক ধরনের ভাষা। গ্রাফিতির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্লোগান, সমকালীন কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া বা সময়ের জনপ্রিয় কোনো উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হয়।

গ্রাফিতি অঙ্কনের শুরুর গল্প থেকে জানা যায়, গ্রাফিতির সঙ্গে যে নামটি জড়িয়ে আছে, সেটি হলো জেমস জে কিলরয়। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শিপইয়ার্ডের পরিদর্শক। জাহাজ নির্মাণের পর তা পরিদর্শন শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দিতেন কিলরয়।তাঁর অনুমোদনের ভিত্তিতে জাহাজের নির্মাণ শ্রমিকেরা মজুরি পেতেন। কিলরয় প্রতিটি জাহাজ পরিদর্শন শেষে চক দিয়ে একটি দাগ কেটে দিতেন। কিন্তু নির্মাণ শ্রমিকেরা বাড়তি মজুরির আশায় কিলরয়ের দেওয়া দাগগুলো মুছে দিতেন। এ নিয়ে কিলরয়ের সঙ্গে শ্রমিকদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে কিলরয় ঠিক করলেন তিনি চকের বদলে রং ব্যবহার করবেন এবং যা সহজে তুলে ফেলা সম্ভব নয়। তারপর থেকে কিলরয় প্রতিবার জাহাজ পর্যবেক্ষণ শেষে জাহাজের গায়ে লিখে দিতে শুরু করলেন 'কিলরয় ওয়াজ হিয়ার', যার মানে 'কিলরয় এখানেই ছিলেন'। ঠিক এখান থেকেই নতুন বিপত্তির শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি অবস্থায় যখন জাহাজ জার্মানিতে পাঠানো হয়, তখন কিলরয়ের সেই চিহ্নসহই অনেক জাহাজ বন্দরে পৌঁছে যায়। এ ধরনের চিহ্ন দেখে জার্মান প্রেসিডেন্ট ভাবেন, এটি নিশ্চয়ই আমেরিকানদের কোনো গোপন কোড। আর এই সুযোগ স্থানীয় শিল্পীরা কাজে লাগিয়ে জার্মানির অলিগলির দেয়ালে অদ্ভুত সব

গ্রাফিতির জন্ম দেন, যা রীতিমতো চারদিকে আতঙ্ক তৈরি করে। এভাবেই একটি সাধারণ পরিদর্শন চিহ্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে একটি প্রতিবাদী ভাষার জন্ম দেয়।

ষাটের দশকের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া থেকে আধুনিক গ্রাফিতির প্রচলন। ডেরিল ম্যাকরে বা কর্নব্রেডকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক গ্রাফিতির জনক। তাঁর হাত ধরেই সত্তরের দশকে নিউইয়র্কের ট্রেন, বাস, বাড়ির দেয়াল প্রভৃতি স্থানে গ্রাফিতি ছড়িয়ে পড়ে। গোপনে করা এসব দেয়াললিখন কেবল লেখাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিবাদী নানা শৈল্পিক চিত্র। এর ফলে পরবর্তী দশকগুলোতে গ্রাফিতি একটি বৈশ্বিক শিল্প হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর বড়ো শহরগুলোর প্রতিবাদের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হয়ে ওঠে গ্রাফিতি। কে বা কারা গ্রাফিতি অঙ্কন করেছে, তাদের আসল পরিচয় কেউ জানতে পারত না, তবে কখনো কখনো এসব গ্রাফিতিতে ব্যবহার করা হতো ছদ্মনাম। এই চিত্রগুলো কখনোই দেয়ালের শোভাবর্ধনের জন্য আঁকা হয়নি, এমনকি জানা যায়নি কোনো শিল্পী এবং পৃষ্ঠপোষকের নাম। সম্প্রতি বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজপথ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ক্যাম্পাস, অলিগলিতে প্রচুর গ্রাফিতির ব্যবহার হয়েছে। আমাদের দেশে গ্রাফিতির প্রচলন শুরুতে বিশেষ বিশেষ স্থানে খুবই স্বল্প পরিসরে গ্রাফিতির ব্যবহার থাকলেও ঢাকার বিভিন্ন দেয়ালে ২০১৭ সালের পর থেকে গ্রাফিতি একটু বেশিই দৃশ্যমান হতে শুরু করে। ঘটনা পরিক্রমায় গ্রাফিতিই এখন হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের এক অনন্য সাধারণ ভাষা। ২০২৪ সালের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আঁকা এমনই কিছু গ্রাফিতি তোমাদের জন্য–

স্বাধীনতার
সূর্যোদয়

JULY'24
MON TUES WED THURS FRI SAT SUN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36
এদেশের বুকে
আঁধারো
আসুক নেমে

We are
one

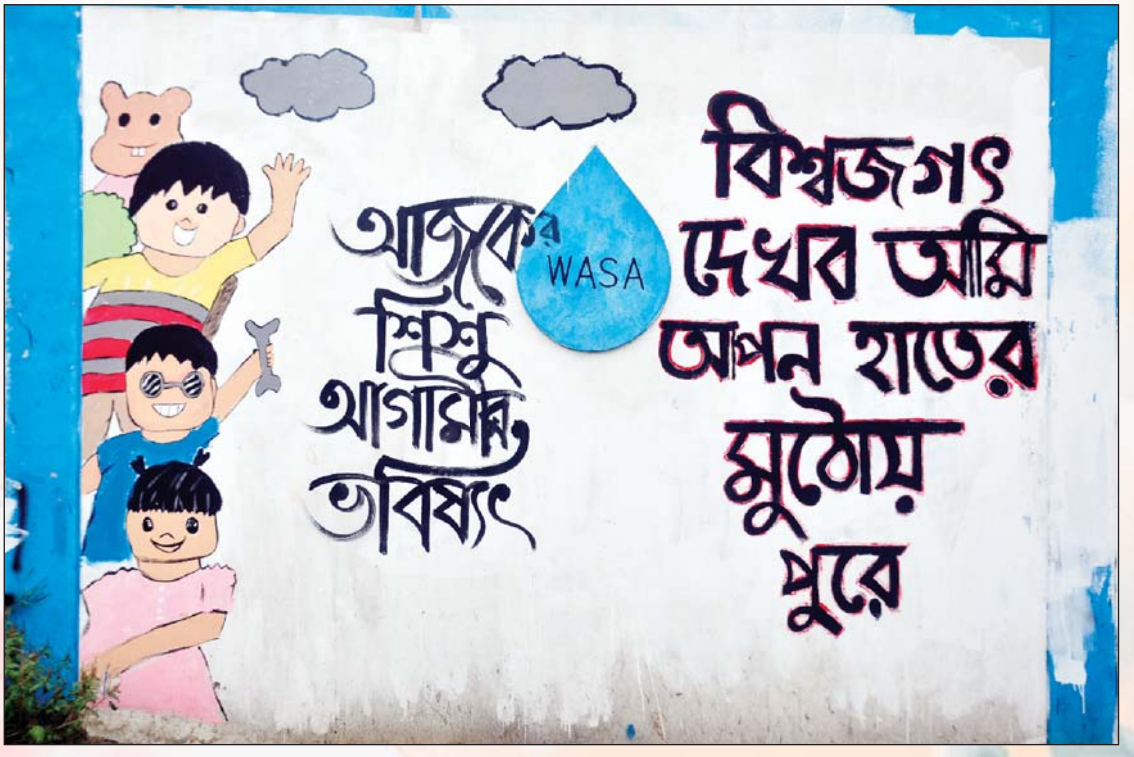
WASA
আজকের
শিশু
আগামীর
ভবিষ্যৎ
বিশ্বজগৎ
দেখব আমি
আপন হাতের
মুঠোয়
পুরে

স্মৃতিকথা

এঁকেছিলাম গ্রাফিতি

মাওজুদা বিনতে সালাম

এই তো গত মাসেরই কথা। ঐতিহাসিক জুলাই ২৪-এর কথা। দেশজুড়ে চলছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। মাসের প্রথম দিকে স্কুল খোলা ছিল আমাদের। স্কুলের ক্লাস নাইন-টেনের ভাইয়ারা তখন প্রতিদিন আন্দোলনে যেতেন। টেনের অনেক আপুকেও শুনেছি রাজপথে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করতে যেতে। আমি স্কুল থেকে সোজা বাসায় চলে আসতাম। আর যেদিন কোচিং থাকত চলে যেতাম কোচিংয়ে। প্রতিদিন বাসায় এসে বাবার সাথে কথা বলতাম। জানতে চাইতাম আন্দোলনের খবর। তিনি বলতেন, 'একটা যৌক্তিক দাবি নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত কোটা থাকায় অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়ে চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতো। অথচ অসংখ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা কম যোগ্যতা নিয়েই দিব্যি চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। আর ঠকে যাচ্ছে পুরো দেশ।

প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে যাওয়া-আসার পথে রাস্তায় আন্দোলনরত ভাইয়া-আপুদের মিছিল দেখতাম। একজন বলতেন, 'কোটা না মেধা'। বাকিরা এক সাথে বলতেন 'মেধা মেধা'। রিকশায় বসে বসে আমিও তাদের সাথে কণ্ঠ মেলাতাম। বলতাম 'মেধা মেধা'। বাসায় ফিরে ছোটো বোন নিধিকে নিয়েও দিতাম এ স্লোগান। মাঝামাঝি সময়ে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে খুবই খারাপ। হঠাৎ একদিন দেখি মৃত্যুর খবর। পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন রংপুরের আবু সাঈদ ভাইয়া। তাকে গুলি করার সেই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যাই, কান্না চলে আসে। এসব দেখে আর

বাবার কাছে রোজ রোজ আন্দোলনের খবরাখবর শুনে আমারও আন্দোলনে যাওয়ার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু ততদিনে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বাসার আশপাশের সমবয়সি কোনো মেয়ে সাথি না পেয়ে যাওয়া হয় না। আর সাংবাদিকতা চাকরির কারণে তখন বাবারও ব্যস্ততা বেড়ে যায় অফিসে। আমি রাস্তাঘাট তেমন চিনতাম না। তাছাড়া একা একা কোথাও যাওয়ার অভ্যাস না থাকায় শেষ পর্যন্ত বের হওয়া হয়নি। তবে প্রতিটা সময় আন্দোলনের পক্ষে ছিলাম আমরা পরিবারের সবাই। বাবা নিয়মিত আন্দোলনের পক্ষে ফেসবুকে লেখালেখি করেছেন। এমনকি সমালোচনা করে ছড়াও লিখেছেন।

আন্দোলন যখন তুঙ্গে আমার স্কাউটসের বড়ো ভাইয়া মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ভাইয়ার মৃত্যুর খবর পাই স্কাউটসের ফেসবুক গ্রুপে। পুরো গ্রুপে তখন শোকের বন্যা। ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জারেও। তিনিসহ হাজার হাজার ভাইয়া-আপুর ওপর পুলিশের নির্মম নির্যাতন আর শত শত মৃত্যুর খবরে তখনকার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মাতে থাকে। বাসার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি বাবা-মায়েদের আহাজারি, কান্নাকাটি। কত মায়ের বুক খালি হয়ে গেল একটি মাসে। কত ভাইয়া-আপুরা চোখ হারালো, কেউ হারালো পা আবার কেউবা হাত। চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নিল, শুধু দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে।

অবশেষে আগস্টের ৫ তারিখ ৩৬শে জুলাই হয়ে পুরো জাতির জন্য বয়ে আনল এক সুখের বার্তা। আনন্দের ঝিলিক সবার চোখে-মুখে। খুশিতে আমরা দু-বোনও নাচানাচি করলাম অনেকক্ষণ। একবার বারান্দায় যাই তো, আবার ঘরে ঢুকি, আবার বারান্দায় যাই।

এবার শুরু হলো বিভিন্ন দেয়ালে গ্রাফিতি অঙ্কনের পালা। আর্ট স্কুলে পড়ার সুবাদে এ কাজে আমার যাওয়ার আগ্রহ জন্মালো। বাবাকে বললাম, 'গ্রাফিতি আঁকতে যাব।' বললেন, 'অবশ্যই, যাও।' আর আম্মুকে বলে দিলেন রং কেনার টাকা দিয়ে দিতে। ফার্মগেটে নিজের স্কুলের দেয়ালে গ্রাফিতি এঁকে নতুন বাংলাদেশের সৈনিকদের সংস্পর্শ নিলাম আমিও। ❑

নবম শ্রেণি, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের গল্প

এক পরিবারের কান্না

আনাস আহমাদ

চৌদ্দ বছর বয়সি মেহেদী হাসান জুনায়েদ। দুই ভাইবোনের মধ্যে ছিল ছোটো। রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। স্বপ্ন দেখত একদিন বড়ো হবে। পড়াশোনা শেষে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ আর হলো না। ছাত্র-গণ-অভ্যুত্থানে যোগ দিতে তার

বন্ধুর সঙ্গে চাঁনখারপুলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে চলে গেল না ফেরার দেশে। নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের বাড়িতে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে পুরো পরিবার।

ঘর জুড়ে সন্তানের রেখে যাওয়া স্মৃতি আঁকড়ে কেঁদে যাচ্ছেন বাবা-মা। মা সোনিয়া জামান বিলাপ করে বলেন, আমাদের সন্তান ছিল আমাদের রত্ন। মেহেদী মেধাবী এবং সাহসী ছিল। ঘটনার দিন সকালে মেহেদীকে রসুন ভর্তা দিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছিলাম। এ সময় মেহেদী বলেছিল এর আগে সে দু'বার আন্দোলনে গিয়েছিল এবং সেখানে খাবারও বিতরণ করেছিল। মেহেদীর মা বলেন, ঘটনাস্থলে থাকা মেহেদীর এক বন্ধু জানায়- মেহেদী রাস্তার পাশে অন্যদের সাথে ছিল। ওর কোনো দোষ ছিল না। আমি গর্বিত যে আমার ছেলে ন্যায়ের জন্য রাজপথে দাঁড়িয়েছিল।

পুরান ঢাকার ধুপখোলা পুকুরপাড়ে মেহেদীর বাসায় গিয়ে দেখা যায় তার ব্যবহৃত সবকিছুই সাজানো- গোছানো, নেই শুধু মেহেদী। সে খেলাধুলা খুব পছন্দ করত। পরিবারের সবার ছোটো হওয়ায় তাকে সবাই ভালোবাসত। একমাত্র বোন ছিল তার বন্ধু, সারাক্ষণ বোনের সঙ্গে গল্প করে। মাতিয়ে রাখত পুরো ঘরটি। তাকে হারিয়ে পরিবারটিতে এখানো থামেনি শোকের ছায়া। নীরব হয়ে রয়েছে বাসাটি। কাঁদতে কাঁদতে তার মা বলেন, ওর বাবা বাসা থেকে বের হয় না, একদম নীরব হয়ে গেছে। মেয়েটা ওর বন্ধুকে হারিয়েছে। মেহেদী বাসায় থাকলে সারাক্ষণ আম্মু আম্মু করত। আমি খুব মিস করছি আমার সন্তানটিকে। মেহেদী ফাস্টফুড আইটেমগুলো খেতে খুব পছন্দ করত।

আমার সন্তান চলে যাওয়ার একমাস পার হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে সবসময় মনে হয় ও ঘরেই আছে। আমি রাতে প্রায়ই ওকে স্বপ্ন দেখি। আমার সন্তানটির এই শূন্যতা কেউ পূরণ করতে পারবে না। দুইটা সন্তানকে কোনোদিন হাত-পা, শরীর কাটতে দেইনি এত যত্ন করে বড়ো করেছি। আমি যখন মেহেদীকে দেখি তখন ওর শরীর রক্তে ভেজা ও মাথায় ব্যান্ডেজ করা ছিল। এরা তো খুব বেশি কিছু চাইছিল না। এরা তো আমাদের রত্ন ছিল। আমরা মায়েরা গর্বিত যে এমন সন্তানদের জন্ম দিয়েছি। তিনি বলেন, অন্য দিন ঘুম থেকে দেরি করে উঠলেও ওইদিন সকাল ৬টার সময় ঘুম থেকে উঠে যায় মেহেদী। এ সময় শুয়ে শুয়ে আন্দোলনের ভিডিও দেখে।

সকাল ১০টায় নাশতা খেতে খেতে মেহেদী বলে, আম্মু রসুন ভর্তা দিয়ে ভাত খাবো। তখন আমি তাকে রসুন ভর্তা দিয়ে ভাত খাইয়ে দেই। এ সময় মেয়েটা আমাকে বলে আম্মু আমি কলেজে যাবো। তখন আমি মেয়েকে বলি তাহলে তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বের হয়ে যায় বুকের মানিকটি। আমিও ছেলে বের হওয়ার পাঁচ মিনিট পর মেয়েকে নিয়ে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দিকে যাই। তখন রাস্তায় অনেকবার পুলিশের বাধার সম্মুখীন হই। সোয়া দুইটার দিকে হঠাৎ আমার বড়ো ভাই কল দিয়ে বলে মেহেদী কই? ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় গুলি লেগে রাস্তায় পড়ে আছে মেহেদী। খবর শুনে আমি রিকশা নিয়ে বাসার দিকে চলে আসি। বাসায় এসে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমার সন্তান আর নেই। ভেবেছিলাম হয়ত কোনো আঘাত লেগেছে কিন্তু এসে দেখি আমার মেহেদীর নিথর দেহ। ❑

দারুস সাফা হাফেজিয়া মাদরাসা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

ছোটোদের গল্প

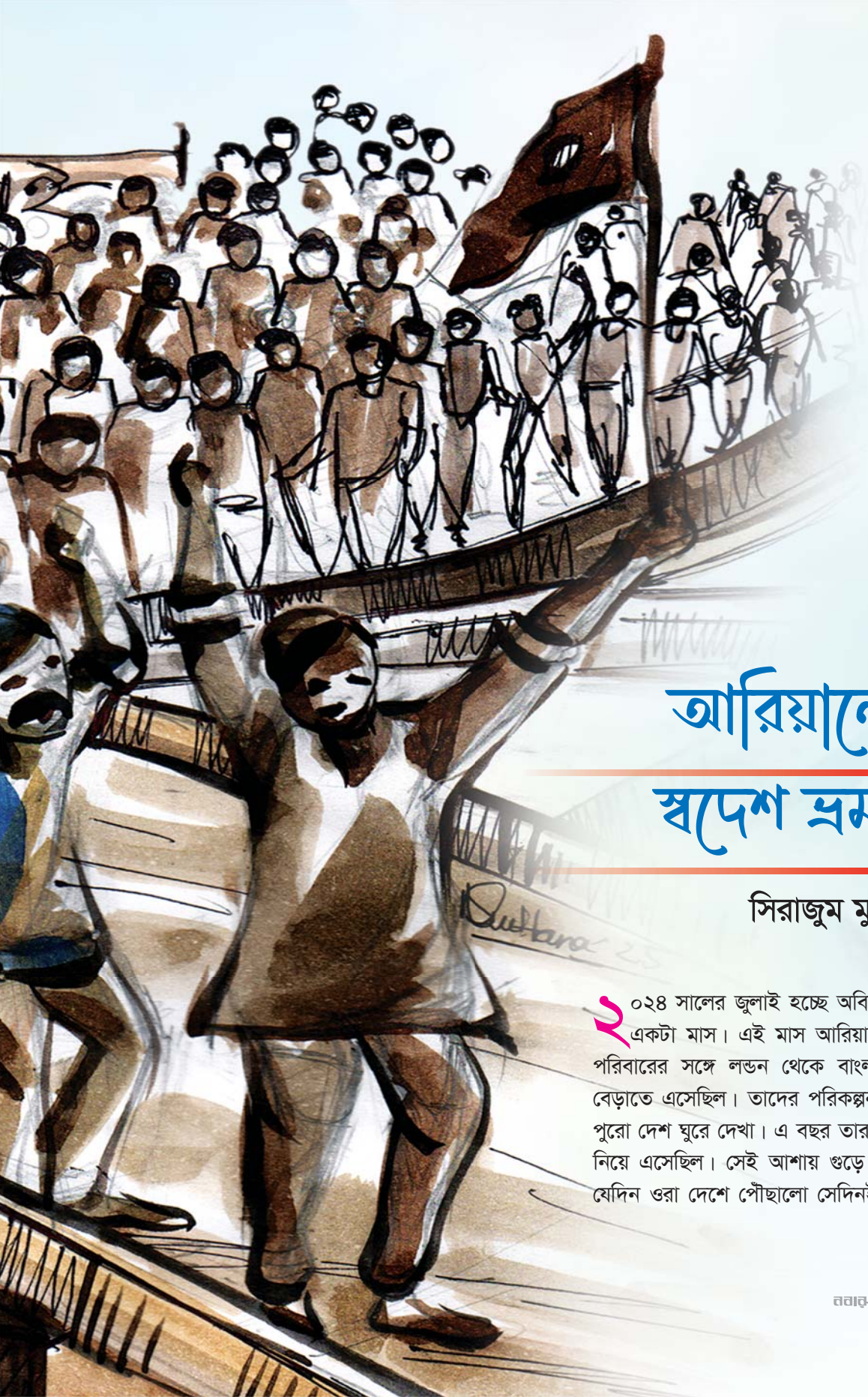

আরিয়ানের স্বদেশ ভ্রমণ

সিরাজুম মুনিরা

২০২৪ সালের জুলাই হচ্ছে অবিস্মরণীয় একটা মাস। এই মাস আরিয়ান তার পরিবারের সঙ্গে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল পুরো দেশ ঘুরে দেখা। এ বছর তারা আশা নিয়ে এসেছিল। সেই আশায় গুড়ে বালি। যেদিন ওরা দেশে পৌঁছালো সেদিনই সারা

দেশে জারী হলো কারফিউ। সেই সাথে অনলাইনসহ সব নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই অসময়ে দেশে এসে আরিয়ানরা এক রকম বন্দিজীবনে আটকে যায়, শেষ হতে থাকে তাদের ছুটি। তারা আনন্দ-বিনোদনের কোনো উপায় পাচ্ছিল না।

নেটওয়ার্কবিহীন হয়ে পড়ায় দেশ-বিদেশের আত্মীয়পরিজনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে হতাশায় ভুগতে থাকে। কারফিউয়ের জন্য তারা বাইরেও বের হতে পারছিল না। বাসায় বসে বসে প্রতিদিন তাদের কাটত কারফিউ ওঠার অপেক্ষায়। সবাই একসাথে টেলিভিশনের সামনে খবর দেখে আর নেটহীন পরিবেশে পারিবারিক আড্ডা-গল্পে একরকম দিন কাটাতে থাকে।

আরিয়ানদের একটাই অপেক্ষা ছিল–কবে কারফিউ বাতিল হবে। তারা ভেবেছিল এক-দুই সপ্তাহ লাগবে। অথচ দেখতে দেখতে প্রায় একমাস পার হয়ে যায়। এ সময়ে শত শত মানুষ আহত-নিহত হয়। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শহিদ হন আবু সাঈদ ও মুগ্ধের মতো আরো অনেকে। সারা দেশে ঝরতে থাকে একের পর এক তাজা প্রাণ। আর তাই দীর্ঘায়িত হতে

থাকে কারফিউ। ঘর থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। শুধু ঘর থেকে বের হওয়াই বিপদজনক ছিল না, বাসার ব্যালকনিতে দাঁড়ানোও ভয়ানক ছিল। গুলি লেগে প্রাণ চলে যাওয়ার ভয় ছিল সারাক্ষণ। এমনকি ছাদ, জানালাও অনিরাপদ হয়ে পড়ে। মুহুর্মুহু গুলিতে শিশুসহ অনেক জনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে মানুষের মুখে মুখে। আহতও হন অনেকে। এভাবে অনেক মায়ের কোল খালি হয়। তখন সারা দেশের মানুষ বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে।

আরিয়ানদের সেই হতাশার মধ্যে একটাই চাওয়া ছিল কারফিউ উঠে গেলেই তারা তাদের বাড়ি লন্ডনে ফিরে যাবে। তখন স্কুল-কলেজের সব ক্লাস বন্ধ ছিল। ইন্টারনেট ও স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আশপাশের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরাও হতাশায় ভুগতে থাকে। তাছাড়া তারা বাইরেও খেলাধুলা করতে পারছিল না। আরিয়ানরা প্রতিদিন রাতে গুলির শব্দে ভয়ে কেঁপে উঠত।

অতঃপর বহু ঘটনাপ্রবাহের পর আসে ৫ই আগস্ট, যাকে বলা হয় ৩৬শে জুলাই। ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে পতন হয় স্বৈরশাসকের। চারপাশের আনন্দ-উল্লাসের চিৎকারে ঘরে বসে সবার মনে হচ্ছিল যেন, বিশ্বকাপ জয় করেছি। কিন্তু না, এ যে এক নতুন বাংলাদেশের উল্লাস। মানুষের চোখে-মুখে আনন্দ আর বিজয়ের ছোঁয়া রঙিন হয়ে ওঠে। হঠাৎ নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যায়, কারফিউ উঠে যায়। সবাই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়। সবাই পতাকা উড়িয়ে বলতে থাকে, 'আমরা স্বাধীন, বাংলাদেশ স্বাধীন'। আর আরিয়ানরা মাত্র অল্প কিছু দিন ঘোরাঘুরির সময় পায়। সময় ফুরিয়ে এলে নতুন এক স্বদেশের মায়া নিয়ে ফিরে যায় তাদের শহর লন্ডনে। ❑

দশম শ্রেণি, জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

হলো যেন মুক্ত

মায়িদা আক্তার

চারদিকে আজ খুশির জোয়ার
লক্ষ মানুষ হাসছে,
পথে নেমে সবাই যে আজ
সেই খুশিতে ভাসছে।

নতুন করে দেশটা আবার
হলো যেন মুক্ত,
শহিদ হলো সাঈদ ভাইয়া
আরও কত মুগ্ধ।

দেশকে সবাই বাসব ভালো
তাদের মতো করে,
খারাপ লোকের জন্য যেন
প্রাণ কারও না ঝরে।

ষষ্ঠ শ্রেণি, হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল, ঢাকা

সাঈদ ভাইটি আমার

মো. সজিব হোসেন

সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল
করে দুই হাত প্রসারিত
ভয়ের কাছে করেনি সে
নিজের মাথানত।

জীবন দিয়ে লিখে গেলেন
আরেক শ্রাবণ গান
লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে
রয়ে যাবে তার স্থান।

দশম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ছোটোদের গল্প

সেদিন ছিল শুক্রবার

তাহমিদুর রহমান জারিফ

দিনটি ছিল শুক্রবার। আমি ঘুম থেকে উঠে নামাজের জন্য রেডি হয়ে মসজিদে যাই। নামাজ শেষে ফিরেও আসি। সকালটা ভালোই কাটে। দিনটাও কাটছিল। হঠাৎ শুনলাম, আমার চাচাত ভাই মিনহাজ ভাইয়ের গায়ে গুলি লেগেছে। বাসার সবাই এটা নিয়ে আতঙ্কে পড়ে যায়। তখন সারা দেশে কারফিউ। অর্থাৎ ঘরবন্দি থাকতে হবে। সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও ডিসের লাইনও ছিল না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমাদের বাসায় ডিসের লাইন ছিল। তার জন্য আমরা প্রতিদিনের খবর কিছুটা হলেও দেখতে পারতাম। কারফিউ শুরুর কিছু দিন আগে আমার ইতালিতে থাকা কাজিনরা বাংলাদেশে বেড়াতে আসে। আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে আটকা পড়ে কারফিউ-এর জন্য। কিন্তু কত দিন আর এভাবে থাকা যায়? একদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কুমিল্লায় বেড়াতে চলে যায়।

ওই যে আমার চাচাত ভাইয়ের কথা বললাম; মিনহাজ ভাই, আমরা ডাকি মিনা ভাই। মিনা ভাইসহ আমরা বাসার সবাই সেদিন একসাথে জুম্মার নামাজে গিয়েছিলাম। নামাজের পর খেয়েদেয়ে মিনা ভাই কলেজের আইডি কার্ডটি গলায় ঝুলিয়ে শনির আখড়ায়-রায়েরবাগ যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের পরিস্থিতি দেখতে। একসাথে তারা চারবন্ধু ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তারা সামনে এগিয়ে যায়। তখন পুলিশ গুলি ছুড়ছিল। তারা একটি বন্ধ দোকানের পাশে আশ্রয় নিল। হঠাৎ দোকানের শাটারে কিছু পড়ার শব্দ হলো। তাৎক্ষণিক মিনা ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। বুঝতে পারছিল না– কী হলো? বন্ধুরা ধরে তাকে উঠালো। তারপর মিনা ভাই বন্ধুদের বলল, কীরে আমার বাম হাত সামনে আসে না কেন? আরে হাত তো অবশ অবশ লাগে। আরে হাতে তো ব্যথা করতাসে। ডান হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে হাত ভেজা। তখন তার বন্ধুরা দেখল হাতের পিছন থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারছিল না। মিনা ভাই মাটি থেকে নিজের শক্তিতে আর উঠতে পারছিল না। চিৎকার করছিল। সবাই ধরাধরি করে কাছাকাছি হাসপাতালে দেখিয়ে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিল। বাসার সবাই ছোটাছুটি করে হাসপাতালে গেল। তার হাতের ছবি তুলতে চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছবি তুলতে বাধা দিল। কিন্তু চাচা লুকিয়ে ছবি তুলে নেন। পরে আমাদের দেখান।

এরপর শুরু হয় কঠিন কারফিউয়ের মধ্যে বাসা আর হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি। জরুরি বিভাগে মিনা ভাইয়ের পাশের বেডে থাকা আরেকজন ছিলেন, যার গুলি লেগেছিল মাথায়। অনেকের অবস্থা আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশি খারাপ ছিল। অনেকে মারাও গিয়েছে।

কয়েকদিন পর মিনা ভাই বাসায় আসে। সবাই তাকে দেখতে যায়। কিন্তু তার হাতের অবস্থা তখনও ভালো হয়নি। একদিন পর আবার হাসপাতালে যেতে হয়। হাতে রড ঢুকাতে হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে সে। ডাক্তারকে বলত, 'ডাক্তার আমি কি মারা যাবো? তাহলে আমাকে বাসায় পাঠিয়ে দিন। আমি হাসপাতালে মরতে চাই না।' কিছু দিন পর সে প্রায় সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরে।

মিনা ভাইয়ের এই অবস্থার জন্য তখন আমার বাসা থেকে আমাকেও কোচিংয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। কোচিং ছিল শনির আখরায়। এজন্য আমিও একরকম বাসায় বন্দি। এর কিছুদিন পর শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। দেশত্যাগে বাধ্য হন তিনি। কারফিউ উঠে যায়। ইন্টারনেট-ডিস সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। সাথে সাথে দেশের মানুষ আনন্দ মিছিলে বের হয়। মিনা ভাই ঘর থেকে বিজয়ের আনন্দে বিমোহিত হয়। সবার সাথে তার অনুভূতি ভাগাভাগি করতে থাকে। আমার কাজিনরাও কুমিল্লা থেকে এসে ইতালিতে পাড়ি দেয়। স্কুল-কলেজ সব খুলে দেওয়া হয়। সমাপ্তি হয় বাংলাদেশের বৈষম্য। শুরু হয় বাংলাদেশের এক নতুন অধ্যায়। ❑

অষ্টম শ্রেণি, জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

ছোটোদের গল্প

কৃষ্ণচূড়ার ডালে লেগেছে আগুন

মুমতাহিনা জাহান

জুলাইয়ের আর্দ্র গরমে অস্থিরতায় পুড়ছে চন্দ্রায়ণপুর– তখন উল্কাপিণ্ডের মতো ধেয়ে এল আরেক অগ্নিশিখা। কয়েক দশক ধরে কোটা পদ্ধতি লক্ষাধিক মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে, যা বৈষম্যের বিমূর্ত প্রতীক। এত বছর থেকে চলে আসা এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুরু হলো প্রতিবাদ। ব্যানার, স্লোগান, আর মরিয়া মানুষের আর্তনাদে চন্দ্রায়ণপুরের আকাশ-বাতাস, রাজপথ অস্থির হয়ে উঠল।

স্কুলছাত্র ফাহমিদ এ মাসে ষোলোতে পা দেবে। এই ষোলো বছরে একটি বারের জন্যও ফাহমিদের জন্মদিন পালিত হয়নি। কারণ ফাহমিদের জন্মের দিনেই তার এয়ার অফিসার বাবার প্লেন ক্র্যাশে অন্তর্ধান ঘটে। ফাহমিদের পরিবারে ফাহমিদ, তার মা আর স্কুল টিচার ফুফু নাইমা থাকেন। ওর মা কারো সাথে খুব একটা কথা বলেন না, তবে ফাহমিদকে একটা কথা তিনি বারবার বলেন, 'তোমার বাবা জাতির জন্য জীবন দিয়েছেন। একদিন তুমি নিজেই তোমার পথ খুঁজে পাবে।'

সময় সময় ফাহমিদ বিরক্তি বোধ করে। নাইমা ফুপিই মূলত ফাহমিদের দেখাশোনা করেন। তিনি ওর স্কুল টিচারও। ফুপিও একটি কথা বার বার ফাহমিদকে বলেন, 'একটি ন্যায্য সমাজ ভারসাম্যের উপর নির্মিত হয়।' সময় সময় ফুপিকে ফাহমিদের কাছে অবাস্তব মনে হয়, মনে হয় ফুপি যেন আকাশের ওই পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ সিংহাসন থেকে নেমে এসেছেন। ফাহমিদ ছেলেটা ভীষণ ভাবুক। সে মনে করে আকাশ থেকে একটা পরি নেমে এসে তার অসুস্থ মা আর তাকে দেখাশোনা করছে।

নাইমা ফুপি ছাড়াও ফাহমিদের ভাবনার জগতে আছেন নতুন ক্লাস টিচার মনসুর খান। সদ্য ত্রিশ পেরোনো এই মানুষটি সবসময় হাসিমুখে কীসব কথা বলেন: দেশ, আত্মত্যাগ, সাম্য ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছু না বুঝলেও ফাহমিদের বুকটা কেমন যেন ভরে ওঠে; মাঝে মাঝে কান্নাও আসে। ফাহমিদ এসব কারণ এতদিন বুঝে উঠতে পারেনি। আজ জুলাইয়ের নতুন ভোরে সমস্ত উত্তর ওর কাছে স্পষ্ট।

চন্দ্রায়ণপুরের রাজপরিবার যখন বৈষম্যবিরোধী জনতাকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে, চন্দ্রায়ণপুরের বিক্ষোভ পরিস্থিতি তখন নারকীয় হয়ে ওঠে। কোটা আন্দোলন পরিণত হয় সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনে।

একদিন গভীর রাতে ফাহমিদ যখন প্রতিবাদস্থলের প্রান্তে একটি বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে বসেছিল, তখন

হঠাৎ করেই এক বিস্ফোরণ হলো। ফাহমিদের চোখের সামনে সমস্তটা অন্ধকার। তারপর মনে হলো প্রজ্বলিত আগুন থেকে বেরিয়ে এল তার বাবা। শুভ্র অলৌকিক পোশাক তার গায়ে। ফাহমিদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই তার হাত ধরে ফাহমিদ মিলিয়ে গেল অদৃশ্যে।

পুলিশের গুলিতে আরও এক কিশোরের প্রাণ বিসর্জন। ফাহমিদের নিথর দেহ জড়িয়ে ধরে নাইমা ফুপি চিৎকার করে কাঁদছে; কান্না নেই শুধু ওর মায়ের মুখে। তাঁর মুখ উজ্জ্বল, আর দৃষ্টিতে এমন এক চাউনি, যা কোনোদিন তিনি ছেলের দিকে দেননি। স্নেহ-মমতায় ও পুত্রের গৌরবের আলোয় তার চোখমুখ সবকিছু যেন ঝলমলে হয়ে উঠেছে।

বসন্তকাল। স্বৈরাচারী রাজশাসনের অবসান। নতুন রাজা সিংহাসনে বসলেও চন্দ্রায়ণপুর এখনো বিপ্লবের বিধ্বংসী অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কৃষ্ণচূড়া গাছটি লাল ফুলে ভরে উঠেছে। এক বছর আগে এ গাছের নিচেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল কিশোর ফাহমিদ।

সরকারি ক্র্যাকডাউনের দিন সৈন্যরা যখন স্কোয়ারে মিছিল করে কাঁদানো গ্যাস ও গুলি চালায়, বিক্ষোভকারীরা তখন ছড়িয়ে পড়ে। এই গাছের নিচেই আশ্রয় নিয়েছিল ফাহমিদ ও তার বন্ধুরা।

আজকের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো যেন সেসব শহিদদের রক্তের রঙেই লাল হয়েছে। গাছটির ডালে ডালে সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত অগ্নি ফুলগুলো একটি কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়: পৃথিবীতে যখনই অন্যায়ের শাসন শুরু হবে, তখনই প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ এই কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলোর মতোই জ্বলে উঠবে। রাজনৈতিক, ধর্মীয় কিংবা পারিবারিক যে-কোনো প্রকার বৈষম্য থেকে দেশকে রক্ষা করাই জাতির আলোকিত সন্তানদের কর্তব্য। ❑

স্নাতক ১ম বর্ষ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

গল্প

অভিমানী রিয়া

জসীম আল ফাহিম

রিয়া। রিয়ামণি। বছর ছয়েক বয়স। ফুটফুটে চেহারা। মিষ্টি করে হাসে। হাসলে মুখ জুড়ে শুভ্র গোলাপ ফোটে। মাথায় বয়কাট চুল। শান্তশিষ্ট মুগ্ধ স্বভাব তার। দেখলে যে কারো ওর গাল ছুঁয়ে আদর করতে মন চাইবে। রিয়া বড়ো ধৈর্যশীলা। কান্নাকাটি তার স্বভাববিরুদ্ধ। সামান্য ব্যাপার নিয়ে কখনো তাকে

কাঁদতে দেখা যায়নি। তবে মনভরা তার অভিমান। কার সাথে অভিমান, বাবার সাথে। কারণ বাবার সঙ্গ সে খুব কম পায়। সারাদিন বাইরে থাকেন বাবা। তাই রিয়ামণি বাবাকে খুব মিস করে। খুব অনুভব করে। বাবা যখন বাসায় ফিরেন, তখন সে লুকিয়ে থাকবে, ঘরের দরজার পিছনে বা জানালার পর্দার ফাঁকে। বাবা বাসায় ফিরে জোর গলায় ডাকবেন- রিয়া! রিয়া-মামণি! রিয়ামণি! কোথায় তুমি? জলদি এসো! দেখে যাও। তোমার জন্য আমি কত কী জিনিস নিয়ে এসেছি।

কিন্তু রিয়া তো আসে না। কথাও বলে না। চুপচাপ শুধু জানালার পর্দা ধরে টানতে থাকবে। বাবা তখন ছুটে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিবেন। তারপর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিবেন। আর রিয়ামণি বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হাসবে। বাবা তখন জামার পকেট থেকে চুইংগাম, চকলেট, মিমি মেয়ের হাতে গুঁজে দিবেন। এসব পেলেই কেবল রিয়ামণির অভিমান ভঙ্গ হবে। ওর মলিন মুখে হাসি ফুটবে।

আজ কদিন ধরে বাবা বাইরে বেরোতে পারছেন না। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মেতে উঠেছে। আন্দোলনটা প্রথমে কোটা বিরোধী ছিল। এরই মধ্যে সরকার সমর্থিত ছাত্রদের অতর্কিত হামলায় ছয় ছয়জন নিরীহ ছাত্র শহিদ হয়েছেন। যা সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনে ঘি ঢালারই শামিল। ছাত্রসমাজের এখন একটাই দাবি- স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

ফলে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও নিরীহ ছাত্রছাত্রী, পথচারী, সাধারণ জনগণ নিহত হচ্ছে। ছাত্রজনতাও থেমে নেই। ইট, পাটকেল ছুঁড়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

প্রতিদিনই আন্দোলনে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। হতাহতের সংখ্যার সঙ্গে ছাত্রসমাজও কঠোর অবস্থানে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে সরকারি অফিসগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে পড়ে কল-কারখানা, গার্মেন্টসশিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ছাত্রজনতার আন্দোলন কোনোকালে ব্যর্থ হয়নি।

রিয়ামণির বাবার অফিসও কদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। অফিসে যেতে হয় না বলে রিয়া এখন সারাক্ষণ বাবার সাথে থাকে। বাবার সঙ্গ পেয়ে ওর যে কত আনন্দ বলে বুঝানো যাবে না। সেদিন শহর জুড়ে তুমুল গোলাগুলি চলছিল। র‍্যাব, পুলিশও বিজিবি বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রজতার ওপর মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ছাত্ররাও ইট, পাটকেল ছুঁড়ে ঐসবের জবাব দিয়ে চলে। কোথাও কোথাও শোনা যেতে থাকে বোমা ও গ্রেনেডের গগনবিদারী বিস্ফোরণের শব্দ। আগুন, ধোঁয়া এবং মানুষের আর্ত চিৎকার, চেঁচামেচিতে ঢাকার আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

আশপাশের বাসাবাড়ির কৌতূহলী মানুষদের অনেকেই ছাদের ওপর ওঠে আন্দোলন দেখতে থাকে। সে সময় আকাশে কয়েকটি হেলিকপ্টার উড়তে দেখা যায়। ছাত্রদের লক্ষ্য করে হেলিকপ্টার থেকেও অবিরাম গুলি বর্ষণ চলতে থাকে। রিয়ামণির মা-বাবা এবং অন্যান্য বাসার বেশ কিছু মানুষ ছাদের ওপর ওঠে। সে সময় বড়োদের সঙ্গে ছোটোরাও ছাদে ওঠে যে-যার মতো ছুটোছুটি করে খেলা করতে থাকে। ছোট্ট রিয়ামণিও সাথিদের সাথে খেলায় মেতে উঠেছিল। সে সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একঝাঁক বুলেট এসে ছাদের ওপর আছড়ে পড়ে। তারই একটি এসে বিদ্ধ হয় রিয়ামণির বুকে। ছোট্ট রিয়ামণি মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ে ছাদের মেঝেতে। বড়োরা ছুটে আসেন ওর কাছে। ওর মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। রক্তাক্ত শরীরে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে অভিমানী রিয়ামণি চিরদিনের মতো নিথর হয়ে যায়। ❑

গবেষণা কর্মকর্তা, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট

ছোটোদের গল্প

স্বপ্ন পূরণের আন্দোলন

রিতু রাইয়ান

বাবার অভাবের সংসার। পাঁচ ভাই-বোনের সংসারে বর্গাচাষি বাবার আয় সীমিত। বড়ো তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা রফিক উদ্দিন বেশ দেনায় পড়ে যান। সীমিত আয়ে সংসার চালানো কঠিন হলে পড়ালেখা ছাড়তে হয় রুবেলকে।

এক সময় রফিক উদ্দিন বেশ টেনশনে পড়ে গেলেন। রুবেল বাবাকে সাহস দিলো। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন। কিন্তু রুবেলের পড়ালেখার খরচ বহন করতে না পারায় বাবা ভেঙে পড়েন। রুবেল বাবাকে সাহস দিয়ে বলল, বাবা তুমি টেনশন করো না। ছোটো-ভাই রনির লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব আমার। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড়ো করব। তখন অনেক সুখ আসবে আমাদের ঘরে। আর তোমারও স্বপ্ন পূরণ হবে।

স্বপ্ন পূরণের টানে গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসেন রফিক উদ্দিন। রনিকে নানার বাড়িতে রেখে আসেন। ঢাকায় এসে বাবা রিকশা চালানো শুরু করেন। রুবেল একটি পোশাক কারখানায় কাজ খুঁজে নেয়।

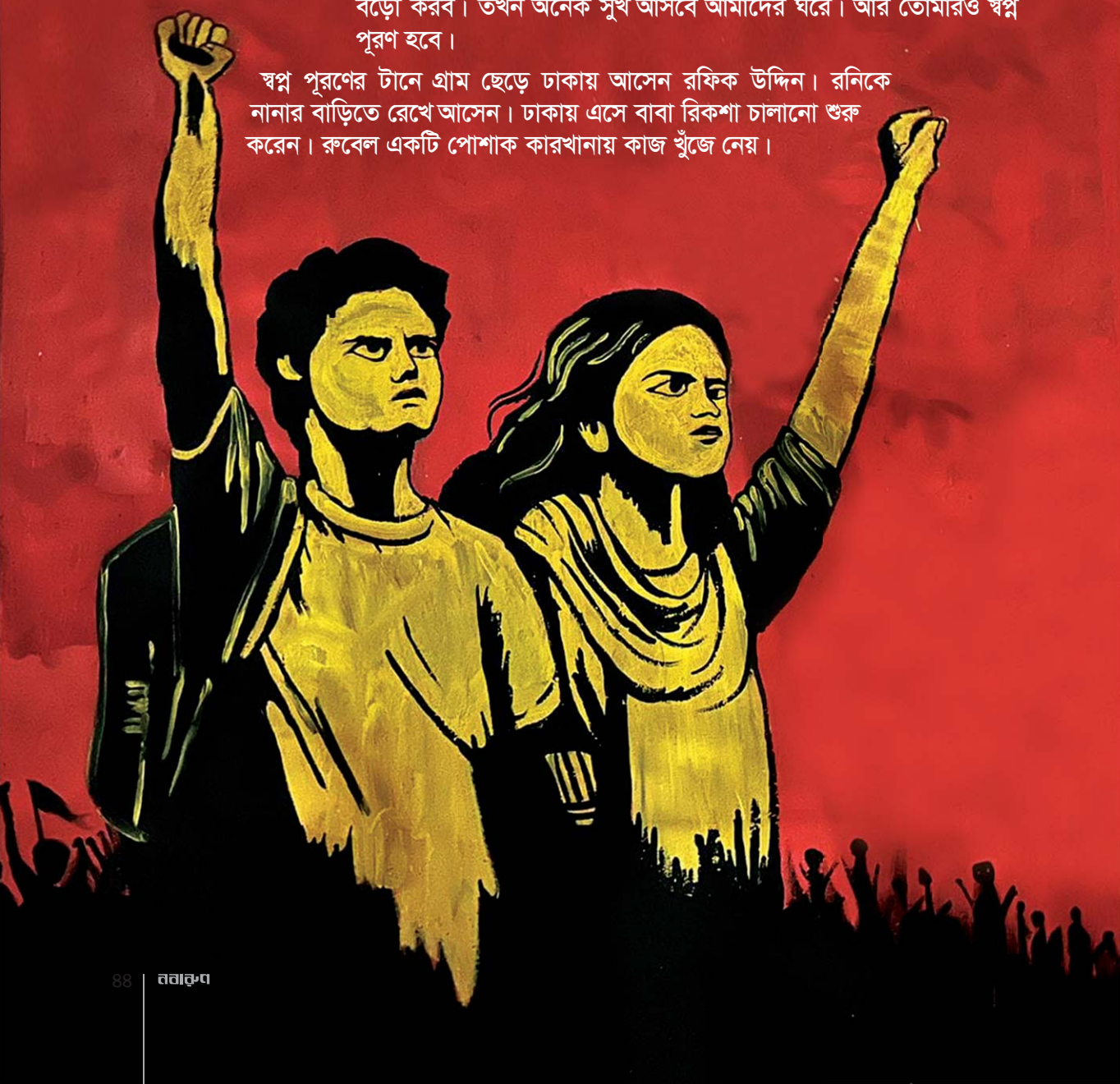

নতুন করে স্বপ্ন আঁকতে থাকে বাবা-ছেলে দুজন মিলে। রনির পড়ালেখার খরচ মেটানোর দায়িত্ব নেয় রুবেল। বাবা দায়িত্ব নিলেন দায়-দেনা পরিশোধের।

এভাবে চলছিল তাদের ঢাকার জীবন। রুবেলের মনে হাজারও স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ইশারা দিতে থাকে। স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। রনিকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করবে। নীলফামারিতে কিনবে বাড়ির ভিটা। গড়বে পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা। ঘরে তাদের সুখের অভাব থাকবে না।

কিছুদিনের মধ্যে দেশে শুরু হলো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ১৬ই জুলাই রংপুরে আবু সাঈদ শহিদ হন। এতে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-আন্দোলন ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। বিষয়টা রুবেলকেও ভাবালো। দেশের এমন পরিস্থিতিতে ওর বসে থাকা ঠিক হবে না। বাবার সঙ্গে কথা বলল। বাবা তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করলেন। মা মিনি খাতুন বুকে জড়িয়ে কান্না করলেন। কোনোভাবেই তারা ছেলেকে যুদ্ধে যেতে দেবেন না। কিন্তু রুবেলের মন মানে না। বাবা-মাকে অনেক বুঝিয়েও কাজ হলো না। পোশাক কারখানায় মাঝেমধ্যেই রাতে ডিউটি করতে হয়। ডিউটি শেষ করে বাসায় ফিরতে সকাল হয়। রুবেল বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনে অংশ নেয়। সারারাত কারখানায় ডিউটি। তারপর সারাদিন আন্দোলন। বাসায় ফিরতে দেরি হওয়ায় বাবা ফোন করেন। বাবাকে আর মিথ্যে বলতে পারেনি রুবেল। দেশের এমন সময় তার বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই তো আন্দোলনের ডাকে তাকেও শামিল হতে হয়েছে। তুমি টেনশন করো না বাবা। দেশকে স্বৈরশাসকের হাত থেকে মুক্ত করতে আর বেশি সময় লাগবে না। এমনই কিছু কথা বাবাকে সেদিন বলেছিল রুবেল।

৫ই আগস্ট ২০২৪। সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা গণভবনের দিকে এগিয়ে আসে। সারা ঢাকা লোকে লোকারণ্য। এ যেন জনসমুদ্র। রুবেলও কারখানা থেকে কাজ শেষ করে সরাসরি অংশ নেয়। আন্দোলনের জোয়ার তছনছ করতে প্রশাসন রাক্ষসের রূপ ধারণ করে। উন্মাদের মতো চারিদিকে মানুষ মারতে শুরু করে। রক্তে লাল হতে থাকে ঢাকার রাজপথ। হকার ফেরিওয়ালা থেকে শুরু করে বারান্দায় খেলতে থাকা শিশুও বাদ যায়নি জালিম শাসকের বুলেট থেকে। দেশজুড়ে চরম উত্তেজনা ও আহাজারি। মানুষ এ জালিম শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে চায়। মুক্ত হতে চায় চরম এ বৈষম্য থেকে।

দুপুরের আগেই গণভবন এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ এক কাতারে মিলিত হলে বিজয় তাদের সুনিশ্চিত এগিয়ে আসে। রুবেল অন্যদের সাথে মিশে যায়। স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলে গণভবনের দিকে। মিছিল আদাবর থানার সামনে এলে পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়। মিছিলের সামনের সারিতে ছিল রুবেল। ঘাতক পুলিশের ছোড়া গুলিতে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে রুবেল।

স্বৈরশাসক দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। দেশের মানুষ ফিরে পায় আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ। কিন্তু বাবা রফিক উদ্দিনের ঘরে কোনো খবর আসে না। ছেলেকে বারবার ফোন দেন। সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় মোবাইলের অপরপ্রান্ত। মা মিনি খাতুন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যাচ্ছেন এখানে সেখানে। বাবা জনে জনে খোঁজ করছেন ছেলে রুবেলের কথা। কিন্তু কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারে না। বাবা কোনো কূলকিনারা না পেয়ে থানায় খোঁজ নিলেন। থানায় কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। ছুটে গেলেন বিভিন্ন হাসপাতালে। শ্যামলীর সিটি হাসপাতালে গিয়ে পেলেন রুবেলকে। সাদা কাপড়ে মোড়ানো ছিল ছেলের দেহখানা। মুখের কাপড় সরিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সেদিন থেকে রফিক উদ্দিন আজ পর্যন্ত নির্বাক। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। আর উৎসুক চোখে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন। ❑

দশম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

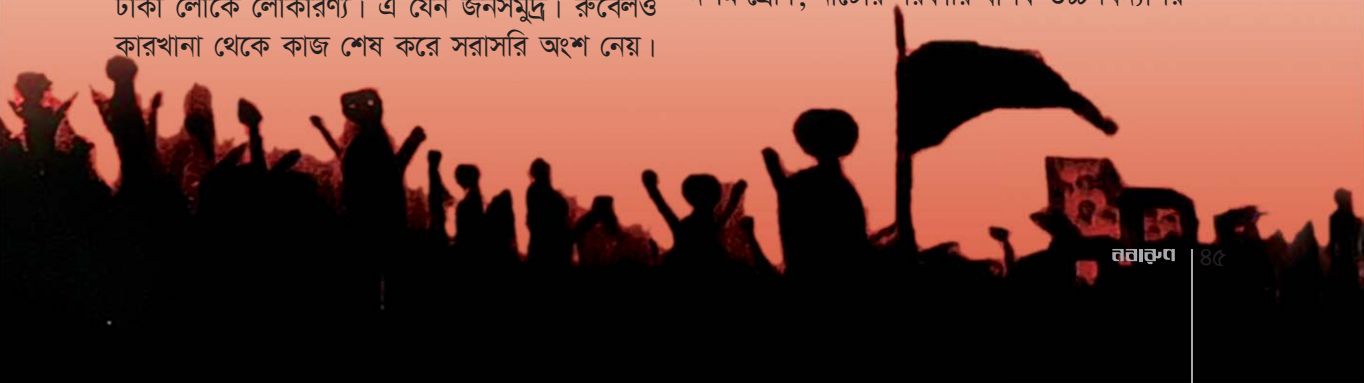

পানি লাগবে

তৌফিক আলম

মুগ্ধ গেল ছাত্র আন্দোলনে
হাতে বোতল ভরা পানি
পানি লাগবে পানি
মুখে তার অমর বাণী।

দৌড়ে দৌড়ে সবার হাতে
দিয়ে বেড়ায় পানি
মুখ থেকে হারিয়ে গেল
শত কষ্ট গ্লানি।

হঠাৎ মাটিতে পড়ল লুটিয়ে
শরীর থেকে ঝরছে রক্ত
নিজের জীবন বিলিয়ে
দেশকে করেছে শোষণ মুক্ত।

দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু সাঈদ

এইচ এস সরোয়ারদী

কে বলেছে সাঈদ নেই?

সাঈদ আছে সবুজ মাঠে
গাঁও গেরাম আর বন্দরে
সাঈদ আছে এই বাংলার
সব মানুষের অন্তরে।

আবু সাঈদ ঘুমিয়ে আছে
দিসনে ওকে ডাক
গুলিবিদ্ধ আবু সাঈদ
থাক ঘুমিয়ে থাক।

রাফসান চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, কুর্মিটোলা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা

কোটা সংস্কারের ছাত্র আন্দোলনে বিগত সরকারের পতনের পর রাজধানীতে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছিল মন্থর। ৫ই আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করলে রাজধানীতে অগণিত মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। আন্দোলনে বিজয় অর্জনের আনন্দেই তারা উদ্বেলিত ছিল। মিছিল আর বিজয় উল্লাসেই কেটে যায় দিনটি ।

পরদিন ৬ই আগস্ট সড়কে যানবাহনের সংখ্যা ছিল কম। হাতে-গোনা কিছু বাস চলাচল করেছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলের সংখ্যাও ছিল কম। দিনের প্রথম ভাগে সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি প্রায় দেখাই যায়নি। তবে দুপুরের পর থেকে কিছু কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়। রিকশাই ছিল শহরের প্রধান যানবাহন। দিনের প্রথম ভাগে যানবাহনের সংখ্যা কম থাকায় সড়কগুলোয় তেমন যানজট ছিল না। তবে দুপুর থেকে যানবাহনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় সড়কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাতির এই দুঃসময়ে রাজধানীর সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা পালন করে শিক্ষার্থীরা। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দিনরাত পরিশ্রম করে। এ ছিল এক বিস্ময়কর চিত্র। তারা প্রতিটি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে লেনভিত্তিক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ

করে। রিকশা, মোটরসাইকেল-সিএনজি এবং প্রাইভেট কার ও বাসের জন্য আলাদা লেন নির্ধারণ করে চলাচলের সুযোগ করে দিয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সড়কগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দুই মোড় মিলিত হওয়ায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছিল। লাগছিল জট। এমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা কাজ করে। তাদের এমন উদ্যোগ দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছে। কেউ পানি এনে দিয়েছে তাদের, কেউবা আইসক্রিম। তাদের প্রচেষ্টায় এ দুই মোড়ে যানবাহন চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক করেছে। এ সময় চালকদের নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর জন্য অনুরোধ জানাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের। যারা হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন, তাদের থামিয়ে পরবর্তীতে মোটরসাইকেল চালালে হেলমেট নিয়ে বের হতে বলেন। সচেতন করার পাশাপাশি শাস্তি হিসেবে চালককে সবার শেষে যেতে দেওয়া হয়েছে। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স এলে অন্য গাড়ি থামিয়ে সবার আগে সেটিকে যেতে দিচ্ছিল শিক্ষার্থীরা। সাধারণ নিয়ম হলো, জেব্রা ক্রসিংয়ের আগে সাদা দাগের সামনে গাড়ি থামতে হবে। কিন্তু সে নিয়ম বেশিরভাগ সময়েই মানতে দেখা যেত না এতদিন। শিক্ষার্থীরা এ নিয়ম মানতে বাধ্য করেছিল চালকদের। রাস্তায় সিগনালের পাশাপাশি ফুটপাতে হাঁটা, নির্দিষ্ট স্থান থেকে গাড়িতে ওঠানামা ও গণপরিবহনগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে থামার নির্দেশনা দিচ্ছিল শিক্ষার্থীরা। নিয়ম মেনে চলতে মানুষ ও গাড়িচালকদের বাধ্য করে। বাস-সিএনজি অটোরিকশাগুলো যেন লাইন ধরে চলে, শিক্ষার্থী সে নির্দেশনাও দিচ্ছিল। ছুটির দিনেও রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল সড়কগুলোতে দেখা যায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবেই দেশের সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে এসেছে শিক্ষার্থীরা। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্লাস কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ফিরে গেছে নিজ ভুবনে। তবে দেশের প্রয়োজনে যে-কোনো সময়ে হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত শিক্ষার্থীরা। ❑

শাহানা আফরোজ

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী

যানজট নিরসনে রাজধানীতে ট্রাফিকের সঙ্গে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন শিক্ষার্থীরা। প্রথম পর্যায়ের ৩০০ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর ৬০ জন শিক্ষার্থী এরই মধ্যে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। এ ছাড়া আরো ৩০০ জন নির্বাচন পর্যায়ে রয়েছে । আগামী বছর জুন মাস পর্যন্ত এই শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যাঁদের নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে তাঁরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। দায়িত্ব পালনের সময় প্রতিদিন ৫০০ টাকা সম্মানী পাবেন প্রতিজন শিক্ষার্থী। দায়িত্ব পালনের সময় শিক্ষার্থীদের গায়ে ডিএমপির লোগো-সংবলিত জ্যাকেট থাকবে। জ্যাকেটে লেখা রয়েছে, 'ট্রাফিক সহায়তাকারী ডিএমপি। শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব পালনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে চার ঘণ্টা। এই শিক্ষার্থীদের যাতে লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রতিদিন তাদের দায়িত্ব পালনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্র জানায়, যে সময়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস থাকে না ওই সময়েই তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে মূলত শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক সচেতনতার কাজটিই বেশি করবে। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে তাদের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, আইন বিষয়েও ধারণা দেওয়া হয়েছে

ট্রাফিক পক্ষ পালনকালে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী। ট্রাফিক পক্ষের শেষ দিন থেকে প্রশিক্ষিত ৬০ জন শিক্ষার্থী দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। পর্যায়ক্রমে অন্য প্রশিক্ষিতরাও দায়িত্ব পালন শুরু করবেন। প্রাথমিকভাবে রমনা ও তেজগাঁও এলাকায় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শ্রম, কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রস্তাবিত বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ট্রাফিক বিভাগে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিং

জুলাই-আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতনের পর সারা বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি কিছুটা থমকে যায়। তখন ছাত্র-জনতা দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশ নেয়। এমন পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের বাজার মনিটরিং -এ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের সদস্যরা। ৮ই আগস্ট থেকে রাজধানীর কারওয়ানবাজারে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পাইকারি ও খুচরা বাজারের দামের পার্থক্য, চাঁদাবাজি সিন্ডিকেটের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ঠেকাতে নোয়াখালীর বিভিন্ন বাজার মনিটরিং করেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। ৮ই আগস্ট সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন কাঁচাবাজারসহ অন্য বাজারগুলো মনিটরিং করেন তারা।

সরেজমিনে জেলা শহরের পৌর বাজারে শিক্ষার্থীরা কাঁচাবাজার, মাছ বাজার, মাংসের বাজারে মূল্যতালিকা অনুযায়ী সঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কি না তা দেখেন। এ সময় তারা বাজারের সব বিক্রেতাকে বলে আসেন তারা যেন কোনো ধরনের চাঁদাবাজি না করেন, নিজেরাও যেন কাউকে চাঁদা না দেন। এছাড়া অযথা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তিতে না ফেলারও আহ্বান জানান। এ সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য পাইকারি বাজারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করেন বিক্রেতারা। এছাড়া চিনি স্টক করে রাখা, মাছ ও মুরগির ওজনে কারচুপি, বাজারে চাঁদাবাজি এবং রাস্তার ওপর দোকানপাট, সিএনজিচালিত অটোস্ট্যান্ড পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১০ ই আগস্ট মাদারীপুরের পুরান বাজারসহ বিভিন্ন কাঁচাবাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও দ্রব্যমূল্যের তালিকা পর্যবেক্ষণ করেন। এদিন শহরের পুরানবাজার, ইটেরপুল, কুলপদ্ধিসহ বিভিন্ন কাঁচাবাজার

ঘুরে শিক্ষার্থীরা দোকানে টাঙানো মূল্য তালিকা ও সেই অনুযায়ী পণ্য বিক্রি হচ্ছে কিনা সেটি মনিটরিং করেন। এ সময় তারা বিক্রেতাদের বেশি দামে পণ্য বিক্রি না করার অনুরোধ জানান। পাশপাশি কাউকে চাঁদা না দিতেও পরামর্শ দেন।

'কৃষক-জনতা জিন্দাবাদ, সিন্ডিকেট মুর্দাবাদ- এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে কুমিল্লার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা ন্যায্য মূল্যে নিত্য পণ্য সরবরাহ করে।

১০ই আগস্ট কুমিল্লা নগরীর পুবালী চত্বরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা এ কার্যক্রম শুরু করেন। এদিকে নায্যমূল্যে শাকসবজি কিনতে পেরে খুশি হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, বাজারে শাকসবজিসহ নিত্য পণ্যের যে ঊর্ধ্বগতি তা কমিয়ে আনতে পাইকারি আড়ত থেকে কেনা দামে সাধারণ মানুষের কাছে পণ্য বিক্রি করা শুরু হয়েছে। বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের যে সিন্ডিকেট আছে তা ভাঙতেই এই কার্যক্রম চলমান থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং বাঁচার মনিটরিং টিমের সহায়তা চেয়েছেন তারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের মনিটরিংয়ে স্বস্তি ফিরেছে ভোলার বাজারে। আগের চেয়ে দাম কমেছে গরুর মাংস, খাসি, মুরগি, মাছসহ সব ধরনের সবজির।

১১ই আগস্ট ভোলা শহরের কিচেন মার্কেটের বাজার মনিটরিং-এ নামেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের

শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা উচ্চমূল্যে যাতে কোনো প্রকার মাংস, মাছ, সবজি ও মুদি মালামাল বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য মেমো দেখে মূল্য নির্ধারণ করে দেন।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন বিভিন্ন এলাকার খুচরা ও পাইকারি বাজার মনিটরিং করে ছাত্র-জনতা এ সময় অনিয়মের অভিযোগে বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে সতর্ক করেছে তারা।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ছাত্র-জনতা ঘুরে ঘুরে বাজার মনিটরিং করার সময় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মূল্য তালিকায় ২ দিন আগের মূল্য লিখে রাখেন। পণ্যের দাম কমলেও তা সংশোধন করেননি। এ কারণে তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

শিক্ষার্থীদের বাজার মনিটরিং কার্যক্রমকে সাধুবাদ ভোক্তা অধিদফতরের।

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক বাজার মনিটরিং কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

১০ই আগস্ট রাজধানী মিরপুরে শাহ আলী মার্কেটে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সরেজমিন তদারকিতে গিয়ে তিনি একথা জানান।

তদারকিকালে বাজারের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের

আন্দোলনের পর সারা দেশের ন্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর চৌডালা ইউনিয়নে বিশৃঙ্খলতা এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে বাজারে নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা।

১৮ই আগস্ট বাংলাদেশ ইয়ুথ ক্যাডেট ফোরাম, রোভার স্কাউটস, সাধারণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চৌডালা বাজারে প্রতিটি দোকান ও কাঁচা বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। বাজার তদারকিতে দেখা যায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট বিবিধ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং পণ্যের মজুদ স্বাভাবিক রয়েছে। ❑

তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

শিক্ষার্থীদের ত্রাণ সংগ্রহ

দেশের যে-কোনো দুর্যোগে এগিয়ে আসেন আমাদের শিক্ষার্থীরা- এমনি এক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে আগস্টের বন্যায়। এসময় দেশের বিভিন্ন জেলায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে গণত্রাণ সংগ্রহ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এসব ত্রাণ সামগ্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) স্থাপিত বুথে জমা নেওয়া হয়। সুশৃংখলভাবে ত্রাণ সংগ্রহের কাজ করতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের ঢল নামে। সাধারণ মানুষ ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারায় খুবই আনন্দিত হন।

কেউ গাড়ি করে, কেউবা পায়ে হেঁটে, আবার কেউ রিকশায় যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য নিয়ে ছুটে আসেন। এছাড়াও কেউ কাপড়, কেউ শুকনো খাবার, স্যালাইন, ফিটকারি বা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট নিয়ে এসেছেন। এসব পণ্যসামগ্রী গভীর রাত পর্যন্ত প্যাকেটিংয়ের কাজ করেছেন শিক্ষার্থীরা। শুধু খাদ্যসামগ্রী নয়, সংগ্রহ করা হয় নগদ অর্থও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ ত্রাণ ও নগদ অর্থ নিয়ে আসেন। টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় দেখে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক খুদে শিক্ষার্থীরাও ছুটে এসেছে ত্রাণ দিতে। তারা নিজেদের জমানো টাকা মাটির ব্যাংকে করে মা-বাবার সাথে আসে। নিজ হাতে জমানো টাকা দিতে পেরে খুবই খুশি তারা। তাদের সাথে মা-বাবারাও অনেক খুশি, এত অল্প বয়সে মানুষের প্রতি কিছু করার তাগিদ এক মহানুভবতার উদাহরণ। বুথে থাকা শিক্ষার্থীরা দাতার নাম, পণ্যের বিবরণ লিখে রাখেন খাতায়। অনুদানের অঙ্কও খাতায় লিখে রাখা হয়। বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিরামহীনভাবে কাজগুলো করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র-ছাত্রীরা সেগুলো হাতে বা কাঁধে করে টিএসসির অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ক্যাফেটেরিয়া নিয়ে জমা করেন। ত্রাণের বহর খালি করতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সহসমন্বয়কগণ ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেন। পাশাপাশি সংগ্রহকৃত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে বন্যাকবলিত এলাকায় ছুটে যায় ত্রাণবাহী ট্রাক। শুধু ত্রাণ সংগ্রহ করা ও তা বন্যার্তদের মাঝে পৌঁছে দেওয়াই নয়, বরং বন্যার্তদের উদ্ধার করার কাজেও সাহায্য করেছে শিক্ষার্থীরা। তারা আলাদা আলাদা টিম গঠন করে স্পিডবোট বা কাঠের নৌকা নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে ভানবাসীদের উদ্ধারের কাজ করেন।

দেশের বন্যা কবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে এসেছে। অসহায় মানুষের পাশে এভাবে এগিয়ে আসায় দেশে মহানুভবতার এক মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ মানুষের জন্য এ বাক্যটি আরো একবার প্রতিফলিত হলো শিক্ষার্থীদের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে মানুষের অংশগ্রহণ দেখে। ❑

মেজবাউল হক

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শিক্ষার্থীরা

সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরকার পতনের পর শহরজুড়ে বিশৃঙ্খলায় ময়লা আবর্জনা সৃষ্টি হয়। ৭ই আগস্ট থেকে শিক্ষার্থীরা সড়কের আবর্জনা পরিষ্কার ও দেয়াললিখন মুছে পরিচ্ছন্ন করার কাজে নেমে পড়ে।

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দলবেঁধে শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে দেখা গেছে। তাঁরা গ্লাভস পরে কোথাও সড়ক ঝাড়ু দিয়েছেন, কোথাও আবর্জনা কুড়িয়ে বস্তায় ভরেছেন। আবার শিক্ষার্থীদের অনেকে দলে দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন এলাকার দেয়াল ও সড়কদ্বীপে পরিষ্কার করেন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ধানমন্ডির ২৭ নম্বর সড়কসংলগ্ন এলাকা, রবীন্দ্রসরোবর উন্মুক্ত মঞ্চ ও আশপাশের এলাকায় পরিচ্ছন্নতা ও দেয়াললিখন মুছে নতুন করে রং করার কাজ শুরু করেন।

মুন্সীগঞ্জে দুর্বৃত্তদের হামলা ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সদর থানা ও পৌরসভা পরিষ্কারে এগিয়ে এসেছে শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি শহিদমিনার ও পৌরসভার তিনতলা ভবন পরিষ্কারের কাজেও অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রী সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে। পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই উদ্যোগ চলবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

চলমান পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নিজ উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতার কাজে নেমেছেন সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ১০ই আগস্ট সকাল থেকে জগন্নাথপুর উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের আলীগঞ্জ বাজারে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, জেলা আইনজীবী সমিতি, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জেলা শিল্পকলা একাডেমি,

কেন্দ্রীয় শহিদমিনার এবং শহরের রাস্তা-ঘাটের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায়, শিক্ষার্থীরা ময়লার ভাগাড় পরিষ্কার করেছেন। সরকারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, শিক্ষার্থীরা পৌরসভার সদর রোড ও বাসস্ট্যান্ড বাজারের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করছেন। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করে তারা এলাকার সড়ক ও বাজার পরিষ্কার করছেন।

জামালপুর জেলাজুড়ে শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন। গত ৭ই আগস্ট শহরের বকুলতলা মোড় পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা।৫ই আগস্টের পর জেলাজুড়ে ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সেই সকল ঘরবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাস্তাঘাটের সকল ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ করেন শিক্ষার্থীরা। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় জনগণের সহায়তায় ভাঙা সড়ক সংস্কারের কাজ করেন। তারা উপজেলা সদরের হেলিপোর্ট সংলগ্ন পাকা সড়কের ধসে যাওয়া অংশে বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ব্যবহার করে মেরামত করেন।

৮ই আগস্ট পঞ্চগড়ে শহর পরিচ্ছন্নতায় কাজ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৫ই আগস্টের পর এলোমেলো হয়ে যায় পুরো শহর। শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছেন। সকাল থেকেই তারা বাজারের মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা জিনিসপত্র একত্র করে পরিচ্ছন্ন করেন।

এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগগুলো শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীলতা এবং জনসেবার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। যা স্থানীয় সমাজের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। ❑

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

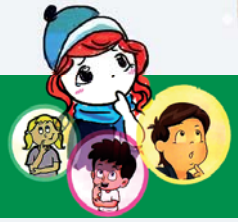

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ৫ই আগস্ট ২০২৪-এ সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের দিনকে রূপক অর্থে জুলাই মাসের কত তারিখ বলা হয়, ৪. শহিদ আবু সাঈদের জেলা, ৬.ময়দান, ৭. উষ্ণ

উপর-নিচ: ১. সাহিত্যের একটি মাধ্যম, ২. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে উপদেষ্টা হওয়া একজন, ৩. জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক, ৫. ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমন করতে বিগত সরকার জুলাইয়ের কত তারিখ প্রথম মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়।

১.						২.	
				৩.			
	৪.						
৫.						৬.	
		৭.					

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: গায়েবানা জানাজা, অনাবাসিক, কবিতাগুচ্ছ, অনন্তকাল, তারিখ, ফুটন্ত, কাকিনা

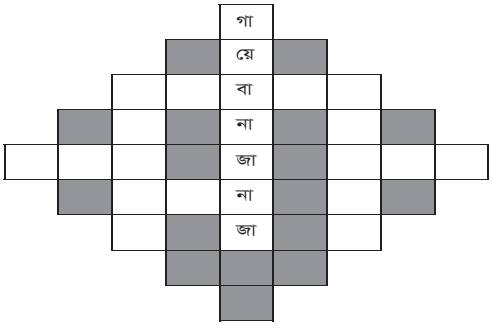

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৯	১০		৪৬			৪৯
	৭			৪৪		৫৬	৫৫	
৩		১			৫৮			
	১৫		১৩		৬১	৬০		৫২
	২৮	২৯		৪১		৭৫		৭৩
১৮			৩৯				৮১	
	২৬	৩১		৩৭				
	২৫		৩৩			৭৮	৭৯	
২১		২৩		৩৫	৬৬			৬৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৩	*		-	৫	=	
+		*		*		+
	/	৪	+		=	৩
/		-		-		+
২	+		-	৩	=	
=		=		=		=
	+	৩	-		=	৮

জুলাই মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

অ	ভি	ধা	ন			গ	
ন		ত্রি		আ	ভ	র	ণ
ল		কা	ছি	ম		ম	
প্র				ন	খ		
বা	য়	স্কো	প		ড়		
হ				ক	ম	লা	
	ব	র্ষা		নু			
	ড়			ই	ঙ্গি	ত	

ছক মিলাও

				উ				
			বা	ই	শ			
		অ		কি				
	তা	ল		পি	ঠা	পি	ঠি	
		কা	বা	ডি			কা	ন
	ধা	ন		য়া		না	না	
		ন্দা			কা	ক		
			ক	পা	ল			
				ল				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	*	১	+	৩	=	৭
/		+		*		-
২	*	২	-	১	=	৩
+		*		-		+
১	*	৩	+	২	=	৫
=		=		=		=
৩	+	৭	-	১	=	৯

নাম্ব্রিক্স

৫	৬	৭	১০	১১	৭০	৭১	৮০	৭৯
৪	৩	৮	৯	১২	৬৯	৭২	৮১	৭৮
১	২	১৭	১৬	১৩	৬৮	৭৩	৭৪	৭৭
২০	১৯	১৮	১৫	১৪	৬৭	৬৬	৭৫	৭৬
২১	২৪	২৫	৪৪	৪৫	৬৪	৬৫	৬০	৫৯
২২	২৩	২৬	৪৩	৪৬	৬৩	৬২	৬১	৫৮
২৯	২৮	২৭	৪২	৪৭	৪৮	৪৯	৫৬	৫৭
৩০	৩৩	৩৪	৪১	৪০	৩৯	৫০	৫৫	৫৪
৩১	৩২	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৫১	৫২	৫৩

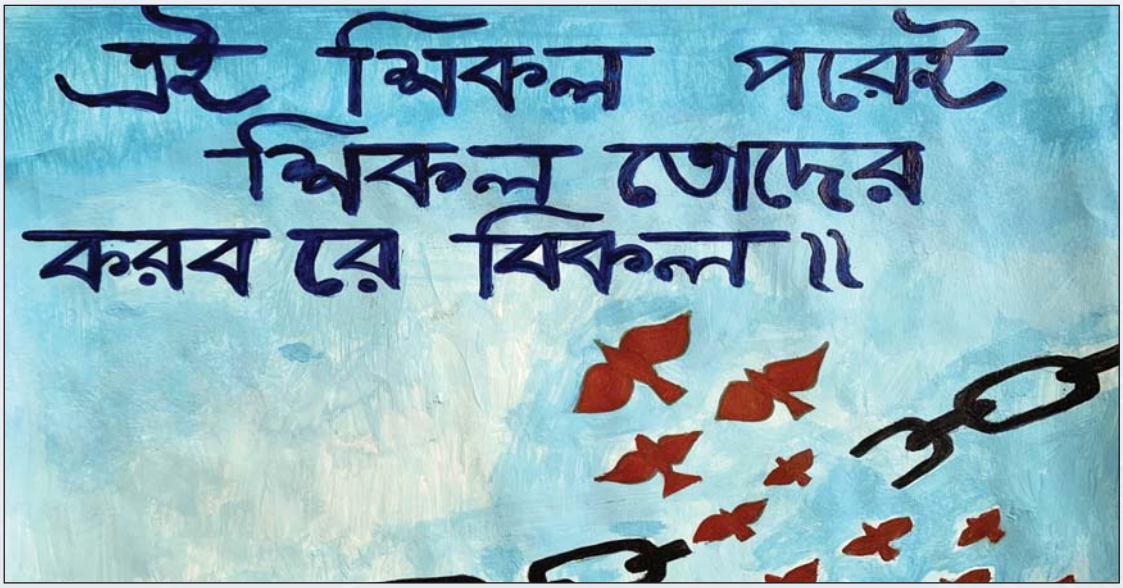

হাফিজা আনান, ৭ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, ঢাকা

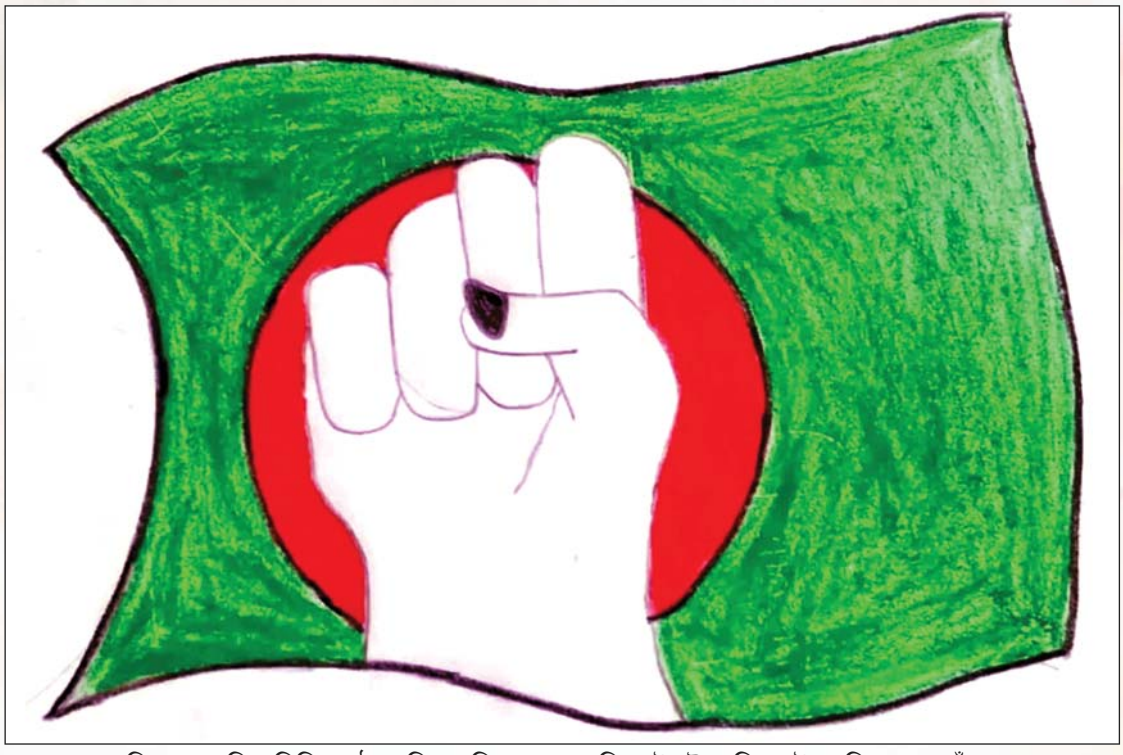

শারিকা তাসনিম নিধি, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজিগঞ্জ সরকারি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর

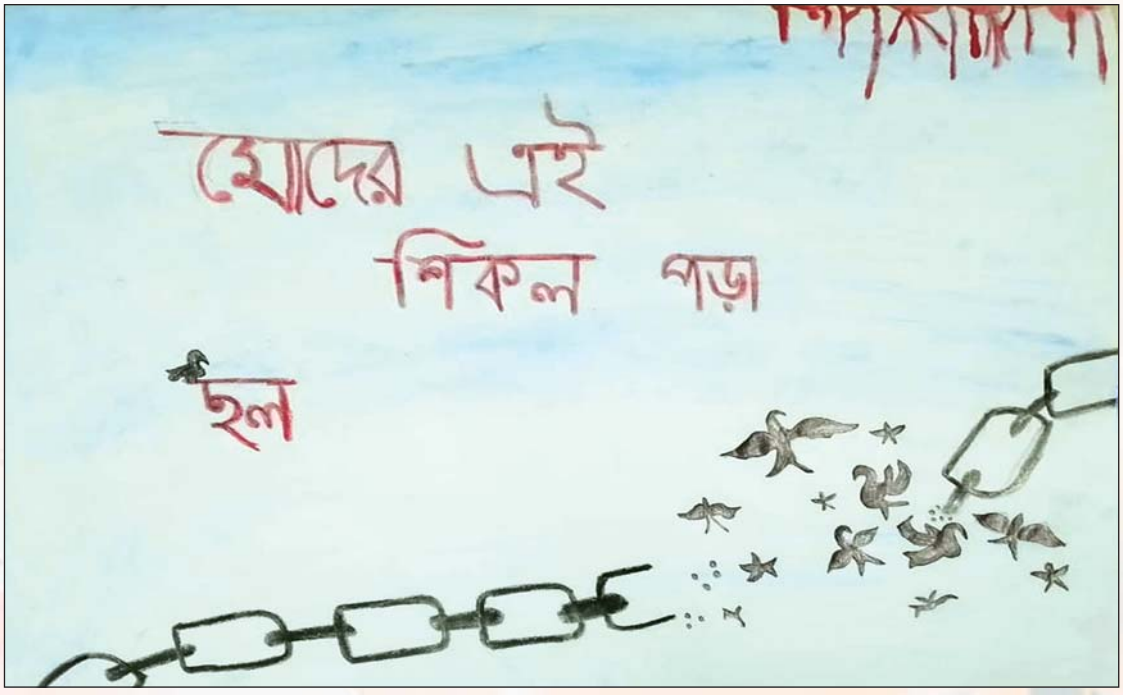

মালিহা ইসলাম, প্রথম শ্রেণি, আওয়ার লেডি অব ফাতেমা স্কুল, কুমিল্লা

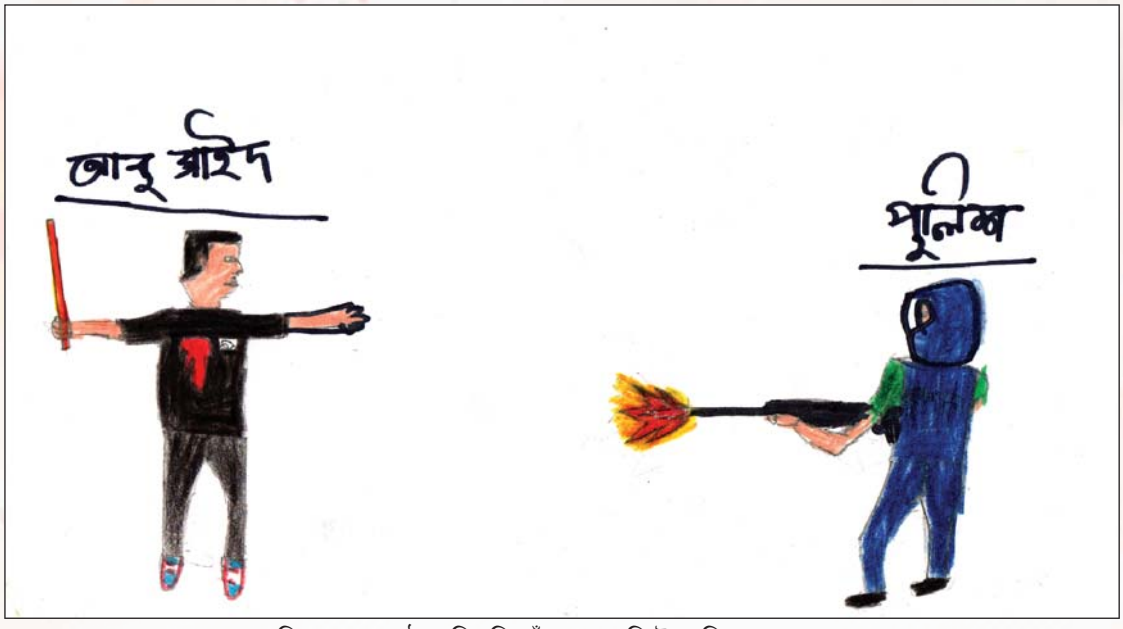

প্রিন্স বোস, ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

জুনায়েদ হোসেন জাবির, পঞ্চম শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

হামজা হোসেন, ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

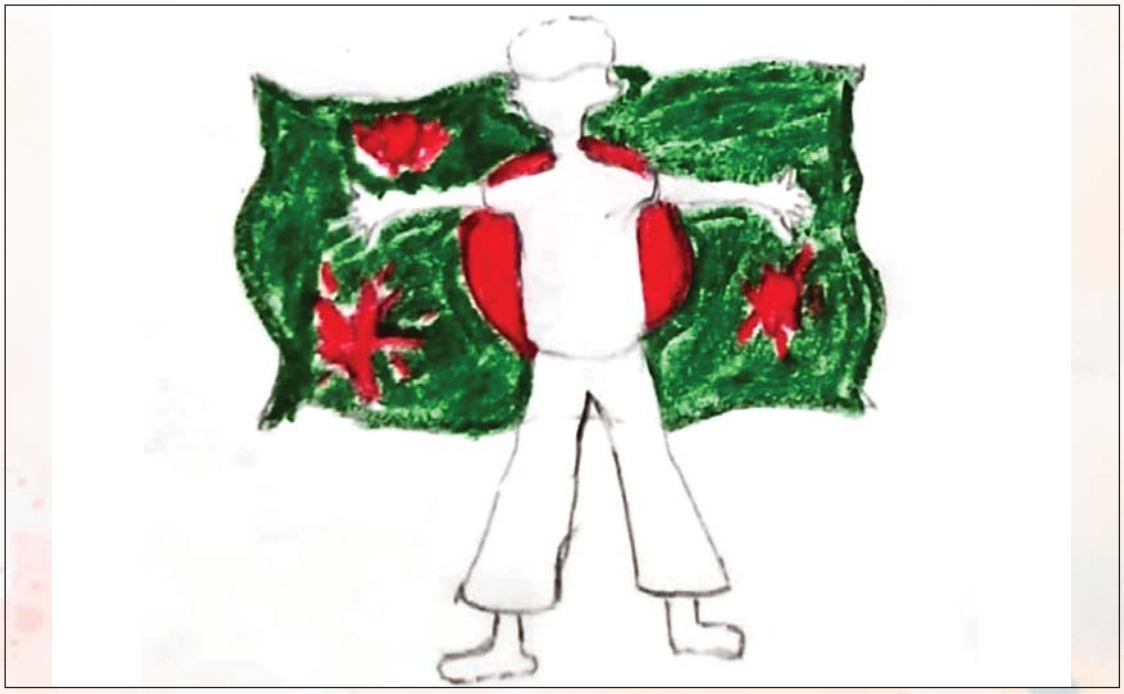

নাফিসা তাসনিম স্নেহা, তৃতীয় শ্রেণি, বারহাট্টা সরকারি মডেল স্কুল, নেত্রকোণা

রামিসা রহমান, দশম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা

অহনা বিথি, ষষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

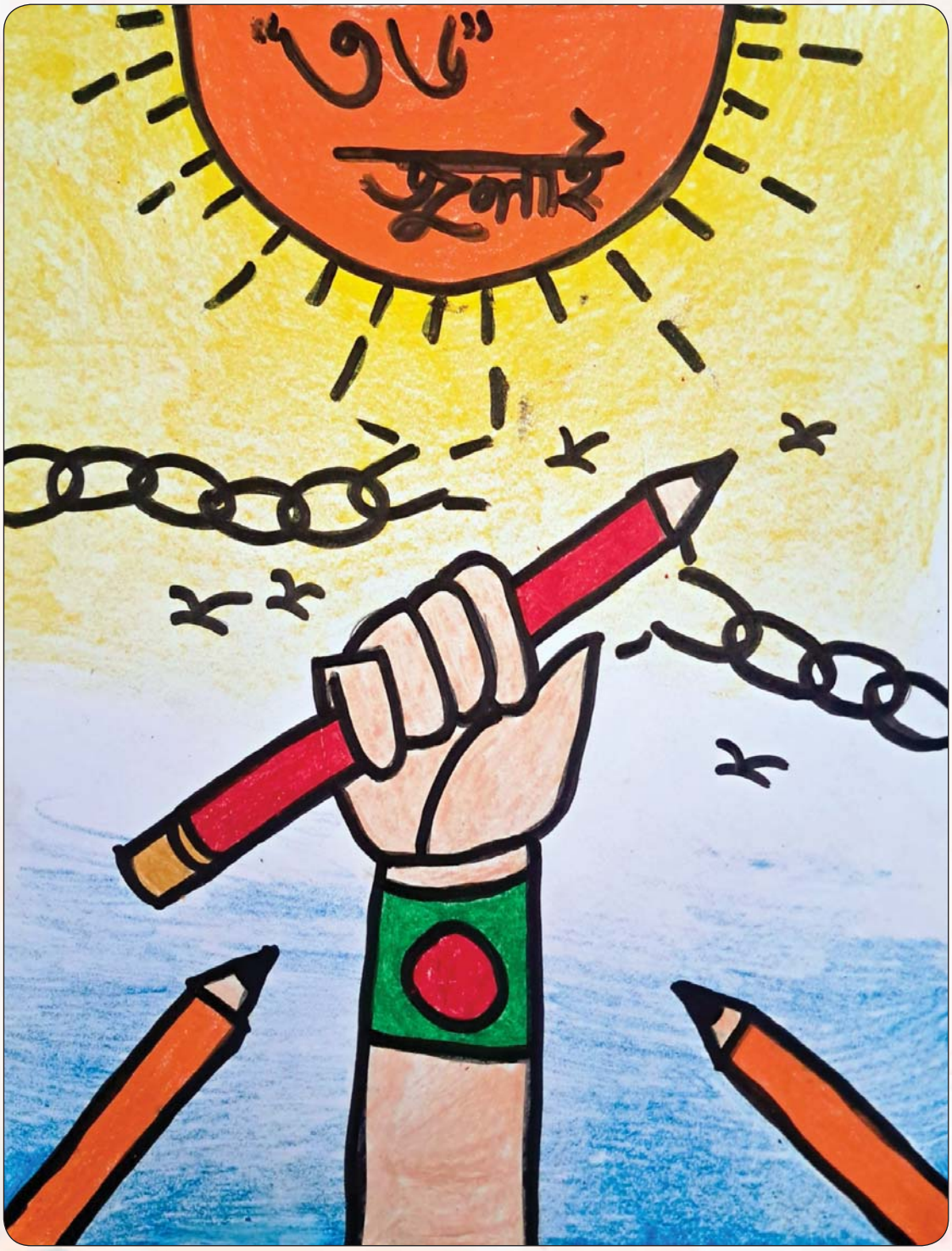

সুস্মিতা শীল, চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট মেরীস স্কুল, চট্টগ্রাম

সেঁজুতি শীল, সপ্তম শ্রেণি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-02. August 2024, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022